সম্মিলিত ভাবনা

১

দেশের কথা পাবলিকেশনস্
মেলারমাঠ ○ আগরতলা

সম্মিলিত ভাবনা
Sammilita Bhabana

প্রথম প্রকাশ
জুন, ২০১৬

প্রকাশনায় :
দেশের কথা পাবলিকেশনস্
মেলারমাঠ ○ আগরতলা

প্রচ্ছদ : সুশীল দাস

মুদ্রণে : ত্রিপুরা প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি:
মেলারমাঠ ○ আগরতলা

দাম : ২০ টাকা

প্রশ্ন: আমাদের পার্টির জেলা/ রাজ্য/ সর্বভারতীয় ও অন্যান্য সব স্তরের সম্মেলনের সময় সম্মেলনের কাজ পরিচালনার জন্য একটি স্টিয়ারিং কমিটি বা পরিচালন কমিটি গঠিত হয়। স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হওয়ার পর নতুন কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত যাবতীয় সাংগঠনিক দায়িত্বভার এই কমিটির উপরে ন্যস্ত থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার প্রশ্ন হচ্ছে: স্টিয়ারিং কমিটির ধারণা যদি এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ হয় তবে পার্টির গঠনতন্ত্রে তার উল্লেখ নেই কেন? পার্টি গঠনতন্ত্রে 'স্টিয়ারিং কমিটি' শব্দটিরই কোনও উল্লেখ নেই (অন্তত নেট-এ প্রকাশিত সংস্করণ অনুযায়ী)। বিভিন্ন স্তরের সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট স্তরের কমিটির রিপোর্টের উপর আলোচনা হয়। কিন্তু স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয় সংশ্লিষ্ট স্তরের সম্পাদকমণ্ডলী কিংবা পলিট ব্যুরোর সদস্যদের নিয়ে। যদি সংশ্লিষ্ট স্তরের পুরো কমিটিকে স্টিয়ারিং কমিটি হিসেবে নির্বাচিত করা হতো তা হলে কি তা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক হতো না?

উত্তর: নির্দিষ্ট স্তরের সম্মেলন আহ্বান করে সংশ্লিষ্ট স্তরের পার্টি কমিটি। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ও ওই কমিটিই ঠিক করে। স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয় যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্মেলনের নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়গুলি শেষ করা যায় সে ব্যাপারে সভাপতিমণ্ডলীকে সাহায্য করার জন্য। তাই স্টিয়ারিং কমিটির কাজ হচ্ছে নির্দিষ্ট স্তরের কমিটির সিদ্ধান্তকৃত অভিমুখকে সম্মেলনে কার্যকর করতে সহায়তা দেওয়া।

সে কারণে স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয় সংশ্লিষ্ট কমিটির কার্যনির্বাহী বা সম্পাদকমণ্ডলীকে নিয়ে। এই সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচিত হয় মূল কমিটির দ্বারাই।

এটা ঠিক যে পার্টি গঠনতন্ত্রে স্টিয়ারিং কমিটির কথা উল্লেখ নেই। গঠনতন্ত্রে শুধু সভাপতিমণ্ডলী ও পরিচিতি কমিটি গঠনের উল্লেখ রয়েছে। আগে যেটা বলা হয়েছে যে, সম্মেলনের সময় মূল কমিটির পক্ষে স্টিয়ারিং কমিটি কাজ করে থাকে এবং পার্টি কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশিত অভিমুখ অনুযায়ী সভাপতিমণ্ডলীর কাজ পরিচালনায় সাহায্য করে, সুতরাং মূল কমিটিই সম্মেলন পরিচালনায় পরোক্ষে ভূমিকা নেয়।

জেলা সম্মেলনে কিংবা রাজ্য সম্মেলনে পুরো জেলা কমিটি কিংবা পুরো রাজ্য কমিটিকে স্টিয়ারিং কমিটি হিসেবে নির্বাচিত করা সম্ভব নয়। তাতে কাজের কাজ কিছু হবে না। সম্মেলনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোচনা শেষ করে উপসংহার টানতে হয়। এ ধরনের বৃত্তিনিপুণ কাজে ৪৫ থেকে ৭৫ জনকে নিয়ে স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের কোনও সার্থকতা নেই। সম্ভবও নয়।

সম্মেলনের প্রতিনিধিরা স্টিয়ারিং কমিটি নির্বাচিত করেন, যেমনটা করেন সভাপতিমণ্ডলী ও পরিচিতি কমিটি নির্বাচিত করে। অবশ্য, এমন কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই যে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরাই কেবল স্টিয়ারিং কমিটিতে থাকবেন। জেলা বা রাজ্য

কমিটির কোনও সদস্যকেও স্টিয়ারিং কমিটিতে থাকার প্রস্তাব করা যেতে পারে। যদি মনে হয় স্টিয়ারিং কমিটির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে মূল কমিটির কোনও সদস্যকে স্টিয়ারিং কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন তবে তা করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: সি পি আই (এম)'র ২১ তম কংগ্রেসের পর্যালোচনায় বলা হয়েছে "আমাদের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার অন্যতম একটি কারণ ছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক দলসমূহের সঙ্গে আমাদের নির্বাচনী আঁতাত ও বোঝাপড়ায় আসা। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের নিজস্ব সত্ত্বা ও স্বাধীন ভূমিকার সঙ্গে আপস করেছি। আমরা জনগণের আস্থাভাজন হতে ব্যর্থ হয়েছি।" — আমার মনে হচ্ছে, এই মূল্যায়নে ত্রিপুরায় কংগ্রেস ফর ডেমোক্র্যাসি (সি এফ ডি)'র বকলমে কংগ্রেসেরই একাংশের সঙ্গে ১৯৭৭ সালে আমাদের জোট গঠন এবং ২০০৮ সালে কেন্দ্রে কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করে আমাদের যে ভিন্নধর্মী ফলাফল হয়েছিল তা বিবেচনায় আনা হয়নি। একই রাজনৈতিক রণকৌশলগত নীতিতে এই বিপরীতমুখী ফলাফলকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে।

উত্তর: সি পি আই (এম)'র ২১ তম কংগ্রেস বিগত ২৫ বছর যাবৎ পার্টির রাজনৈতিক রণকৌশলগত নীতির পর্যালোচনা করেছে। গত শতাব্দীর নব্বই-র দশকের গোড়ার দিকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন, সারা বিশ্বে উদারবাদী নীতির আগ্রাসী প্রবর্তন ও সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের পরিপ্রেক্ষেতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে শক্তি সমূহের ভারসাম্যের পরিবর্তনের ফলে পার্টির রাজনৈতিক রণকৌশলগত নীতির পর্যালোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

এই পর্যালোচনার উপসংহারে একাংশে বলা হয় যে, রাজ্যে রাজ্যে শক্তিশালী আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে আঁতাত করার ফলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে পার্টির নিজস্ব নীতিমালা জনগণের সামনে তুলে ধরা এবং স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠা ব্যাহত হয়। পুঁজিবাদের এই নয়া উদারবাদী জমানায় আঞ্চলিক দলগুলিও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিমালার পরিবর্তন ঘটায়। বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতায় বসে এরা নয়া উদারবাদী নীতিই বাস্তবায়ন করে। তারা কেন্দ্রীয় সরকারে অংশ নেয়ার জন্য কখনো বিজেপি বা কখনো কংগ্রেস দলের সঙ্গে সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণ করে। কাজেই এই ধরনের দলসমূহের সঙ্গে আঁতাত করার ফলে সি পি আই (এম)'র স্বাধীন শ্রেণী অবস্থান অনেকাংশে ম্লান হয়ে পড়ে। এই কারণে পার্টির গণভিত্তিতে চির ধরেছে।

এই প্রেক্ষাপটেই পার্টির উপরোক্ত রাজনৈতিক রণকৌশলগত দলিলে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, পার্টি তৃতীয় বিকল্পকে সামনে রেখে এই সবদলগুলোর সঙ্গে জাতীয়স্তরে

কোনরূপ জোট গঠনের উদ্যোগ নেবেনা। অপরদিকে রাজ্যে রাজ্যে বাম গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমবেত করতে ও পার্টিকে শক্তিশালী করতে সহায়ক হয় এমন ধরনের জোট গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯৭৭ সালে ত্রিপুরায় " কংগ্রেস ফর ডেমোক্র্যাসি"র (সি এফ ডি) সঙ্গে পার্টির নির্বাচনী বোঝাপড়ার যে প্রসঙ্গটি আপনি উল্লেখ করেছেন, তার আগেও পশ্চিমবঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে পার্টির নির্বাচনী বোঝাপড়া হয়েছিল। ষাট ও সত্তরের দশকে মূল কংগ্রেস দল ভেঙে বিভিন্ন রাজ্যে অনেকগুলি আঞ্চলিক দল গজিয়ে উঠে। এইসব দলগুলির সঙ্গে কোন কোন সময় আমাদের দলের নির্বাচনী বোঝাপড়া হয়েছে। কিন্তু তখন পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এইসব আঞ্চলিক দলগুলির বেশিরভাগেরই ভূমিকা ও নীতি ছিল তৎকালীন মূল রাজনৈতিক শক্তি কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে।

আর ২০০৪ সালে কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে সমর্থনের যে বিষয়টি আপনি উল্লেখ করেছেন তা নির্বাচনী আঁতাঁতের ফলে হয়নি। বিজেপি'র মতো একটি সাম্প্রদায়িক শক্তি কর্তৃক কেন্দ্রে সরকার গঠন প্রতিহত করে দেশে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গঠিত হোক মূলত এই লক্ষ্যেই ঐ সময় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন উপা সরকারকে পার্টি সমর্থন জানিয়েছিল।

রাজনৈতিক -রণকৌশলগত নীতিমালা কোন স্থায়ী নীতিমালা নয়। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহের শক্তি ও অবস্থানের উপর নির্ভর করে রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনও পরিবর্তন করা হয়।

প্রশ্ন:-২১ তম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক - রণকৌশলে বলা হয়েছে," রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সি পি আই (এম)-কে নমনীয় কৌশল গ্রহণ করতে হবে।" বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন কি?

উত্তর:-নমনীয় কৌশল গ্রহণের বিষয়টি ২১- তম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনের পর্যালোচনা রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে। এর ভিত্তিতেই রাজনৈতিক প্রস্তাবের রাজনৈতিক -রণকৌশলগত লাইনের অংশে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ওই পর্যালোচনা রিপোর্টে জাতীয় স্তরে বাম দলগুলির সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ বুর্জোয়া পার্টিগুলোর সমন্বয়ে তৃতীয় বিকল্পের ধারণা বাতিল করা হয়েছে। সেখানেই এই নমনীয় কৌশলের কথা বলা হয়েছে।

রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে—" রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে পারে। বুর্জোয়া পার্টিগুলির অভ্যন্তরে এবং পরস্পরের মধ্যে নতুন নতুন দ্বন্দ্ব দেখা দিতে

পারে। এসব দলের মধ্যে ভাঙন ও খন্ডিত গোষ্ঠীগুলিকে নিয়ে নতুন দলের আবির্ভাব ঘটতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় পার্টিকে নমনীয় কৌশল গ্রহণ করতে হবে।"

এর অর্থ হচ্ছে, চলতি রণকৌশলগত লাইন অনুসরণের পাশাপাশি পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী নমনীয় কৌশল গ্রহণের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটতে পারে। বর্তমানে যে সব রাজনৈতিক জোট রয়েছে সেগুলির মধ্যে ভাঙন ধরতে পারে। এসব দলের অভ্যন্তরীণ সংঘাত তীব্রতর হতে পারে। ফলশ্রুতিতে নতুন কোনও রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটতে পারে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের নতুন রণকৌশল গ্রহণ, কিংবা চলতি কৌশল পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সি পি আই (এম) এখন বিশাখাপত্তনম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক -রণকৌশলগত লাইন অনুসরণ করছে। উপরে বর্ণিত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে চলতি লাইনের পরিবর্তন, কিংবা পরিমার্জনের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত যাতে কেন্দ্রীয় কমিটি গ্রহণ করতে পারে, সে জন্যই নমনীয় কৌশলের বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১. সামনের দিকে এগোবার জন্য পার্টিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, সম্প্রতি পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছে হোয়াটস অ্যাপ/ ফেসবুক ইত্যাদিকে ব্যবহার করার। কিন্তু শুধু হোয়াটস অ্যাপ/ ফেসবুক ব্যবহার করেই কি পার্টি এগোতে পারবে?

২. ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলাটাই হচ্ছে কমিউনিস্টদের প্রচার পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিন্তু পুঁজিপতিরা আমাদের চিরাচরিত পদ্ধতি থেকে সরে আসার জন্য আমাদের প্রলুব্ধ করছে। এখন তো মিডিয়া মানুষকে ঘরবন্দি করেই রাখতে চায়। এরা চাইছে সভা- সমাবেশের প্রতি যেন মানুষ আকৃষ্ট না হয়। এদের এই উদ্যোগ আমাদের ভীষণ ক্ষতি করবে। কমিউনিস্টরা কীভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে?

উত্তর: ১. পার্টির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিকল্প নীতির প্রচারে পার্টি বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে। আগে ছাপানো প্রচারপত্র বিলি করে ও মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে পার্টি কর্মীরা প্রচার চালাতো। বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমের আত্মপ্রকাশের পর পার্টি এই মাধ্যমকেও ব্যবহার করে জনগণের কাছে পৌঁছতে চাইছে। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ার বিকাশ ঘটেছে। এটা এখন প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে উঠে এসেছে। এটাই তো স্বাভাবিক যে পার্টি সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন ধারাকে জনগণের কাছে পার্টির বক্তব্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করবে। এটা ঘটনা যে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি যুব অংশের আকর্ষণ

বেশি। যুবদের কাছে আমাদের আরও বেশি করে পৌঁছার প্রয়োজনে সোশ্যাল মিডিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এর অর্থ এই নয় যে, শুধু সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই আমরা যুবকদের আকর্ষণ করবো। প্রচারের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া একটি অন্যতম পদ্ধতি। পার্টিকে এমন ধারায় পরিকল্পনা, কার্যক্রম ও নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে যাতে যুবদের আরও বেশি করে আকর্ষণ করা যায়। সোশ্যাল মিডিয়া এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। একে ব্যবহার করে পার্টিকে নতুন প্রজন্মের কাছে পার্টির রাজনীতি ও নীতিসম্মত অবস্থান পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।

২. বিভিন্ন ধরনের সভা অনুষ্ঠিত করে কিংবা পথসভা, ঘরোয়া সভা এবং জনসভা সংগঠিত করার মাধ্যমে মৌখিক প্রচারের কাজটি আজও কমিউনিস্টদের কাছে প্রচারের মুখ্য উপায় হিসেবে বিবেচিত হবে, প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং নানা ধরনের প্রচার মাধ্যমের আত্মপ্রকাশের সুবাদে কমিউনিস্টরা এগুলিতেও হস্তক্ষেপ করবে। এটা ঘটনা যে অনেকেই পার্টির বক্তব্য জানতে চান, রাজনৈতিক মত বিনিময়ে অংশ নিতে চান এবং ঘরে বসে টি ভি ও সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্য দিয়ে সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে চান। তাদেরকে এসব তথ্য না জানিয়ে আমরা তো চুপ করে বসে থাকতে পারি না।

পাশাপাশি, ভারতে আমরা দেখছি অনেক মানুষ (বড় সংখ্যায়) জনসভাগুলিতে অংশগ্রহণ করছেন। সোশ্যাল মিডিয়া এ ধরনের জনজমায়েতের প্রতিবন্ধক হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে সভা- সমাবেশ ও প্রতিবাদে শামিল করানোর লক্ষ্যেই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ধরনের সভা- সমাবেশ কিংবা প্রতিবাদ আন্দোলনে আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে শামিল করতেই পার্টিকে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

প্রশ্ন: এঙ্গেলস তাঁর ' পরিবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' শীর্ষক বইতে যুক্তি দিয়ে উপসংহার টেনেছিলেন যে, দুই ব্যক্তির মধ্যে প্রেম কিংবা বৈবাহিক সম্পর্ক পুরোপুরি তাদের নিজস্ব ব্যাপার বলে গণ্য করতে হবে। এটা আদিম সাম্যবাদী সমাজে ছিল, এবং ভবিষ্যতে দুনিয়াব্যাপী যে সাম্যবাদী সমাজ গঠিত হবে, সেখানেও দু'জনের যে কেউ সহজেই সম্পর্কের অবসান ঘটাতে পারবে। আইন- আদালতের নাক গলানো ছাড়াই এটা সম্ভব হতে পারে। সোভিয়েত বিপ্লবের পর এক ডিক্রিতে তথাকথিত 'বৈধ' ও 'অবৈধ' শিশুদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পশ্চিমী দেশগুলিতে আজ প্রথাগত বিয়ে ছাড়াই পছন্দসই দুই ব্যক্তির জুটি একসঙ্গে বসবাস করার রীতি

অতি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে দুটো প্রশ্ন জাগছে—

১. এ যাবৎ কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশই আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়া বিবাহ বিচ্ছেদের সমানাধিকারকে আইনি রূপ দেয়নি কেন?

২. ' বিয়ে' এবং 'এক সঙ্গে থাকা'— এই দুটো ধারার মধ্যে পার্থক্য ঘোচানোর এখনও কি সময় আসেনি?

উত্তর : একটি আদর্শস্থানীয় বিশ্বে প্রেম ও বৈবাহিক সম্পর্ক উভয়ের নিজেদের ব্যাপার হওয়া উচিত। এ নিয়ে অন্য কারও কিংবা রাষ্ট্রের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে, আমরা এখন কোনও আদর্শস্থানীয় বিশ্বে বাস করছি না এবং এখন পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমন একটি বিশ্বে আমরা বাস করছি যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। তার ফলে শোষণ ও ক্রমবর্ধমান অসাম্য দেশের ভেতরে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিরাজমান। আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার— শোষণ ও অসাম্যের ধারায় বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে পিতৃতান্ত্রিকতা শক্তিশালী হয়েছে। পিতৃতান্ত্রিকতা শুধু অধিকাংশ পুরুষের মধ্যে মহিলাদের উপর কর্তৃত্ব ফলানোর ধারণাকেই শাণিত করে না, বরং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যেখানে অতি মুনাফার দ্বারা পুঁজিবাদ নিজেই শক্তিশালী হচ্ছে, সেখানে সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত মহিলাদের বিনা মজুরি কিংবা কম মজুরিতে উৎপাদনে অংশ নিতে বাধ্য করা যায়। শুধু তা-ই নয়, বাড়ি ও পরিবারে মহিলারা যে পরিশ্রম করে, যা সামাজিক উৎপাদনেরই অংশ, যেমন স্বাস্থ্য পরিসেবা, শিক্ষা, পরিচর্যা, রান্না করা, কাপড় ধোয়া, শিশুদের লালন - পালন ইত্যাদি কাজের জন্য মহিলাদের কোনও মজুরি দেওয়া হয় না। পরিবারের পুরুষকর্তা যেমন দেয় না, তেমনি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রও দেয় না। অথচ পরিবারের বাইরে থেকে এসব পরিসেবা কেনার জন্য টাকা খরচ করতেই হবে। সেদিক থেকে বিচার করলে মহিলারা বিনা খরচে এসব কাজ করে পরিবারের আর্থিক সাশ্রয়ই ঘটাচ্ছে। অথচ মহিলাদের সমানাধিকার না থাকার কারণে মহিলাদের এই পারিবারিক শ্রমের কোনও আর্থিক মূল্য নেই। রাষ্ট্রেরও ভূমিকা নেওয়ার ব্যাপার আছে। সর্বজনীন শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিসেবা , শিশুর যত্ন, প্রবীণদের পরিচর্যা, খাবারের ব্যবস্থা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে রাষ্ট্র দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে।

আজ নয়া উদারবাদের যূপকাষ্ঠে অনেক পুঁজিবাদী দেশেই সরকারি ও সামাজিক পরিসেবাগুলি থেকে নীতিগতভাবেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। যাও সাধারণ কিছু ছিল, যা বিভিন্ন দেশে অভিন্ন ছিল না, আজ তা বিপজ্জনক দ্রুতগতিতে প্রত্যাহৃত হচ্ছে। এর ফলে শ্রমজীবী জনগণের সকল অংশের উপর নতুন নতুন বোঝা চাপছে ,মহিলাদের

ভুগতে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে। এর জন্যই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মূল্যবোধকে নানাভাবে গৌরবান্বিত করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে এবং প্রয়োজন হয়ে পড়েছে কন্যা, বোন, স্ত্রী ও মা হিসাবে মহিলারা তাদের কাজের দায়িত্ব যাতে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তা সুনিশ্চিত করা।

বৈবাহিক প্রতিষ্ঠানে মহিলারা হচ্ছে অসম শরিক। এটা কখন থেকে হলো ? যবে থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি যাবতীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হলো। মহিলাদের স্বশাসন ও স্বাধীনতা দারুণভাবে খর্বিত হলো উত্তরাধিকারের আইনি মর্যাদা সুনিশ্চিত করার জন্য। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্তর্নিহিত সার কথা হচ্ছে এটাই। বহু শতাব্দী ধরে বিয়ের অর্থ হচ্ছে পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ বিভিন্নতা। বিয়ের পর মহিলারা পুরুষের অধীন হলো এবং তাদের অধিকার খর্বিত হলো। পুরুষদের জন্য বিয়ে তাদের যাবতীয় সুখ ও তৃপ্তি এবং আইনি উত্তরাধিকার নিশ্চিত করল। তাদের জন্য যৌনাচার ও অন্যান্য কার্যকলাপের উপর কোনও বাধা নিষেধ আরোপিত হলো না।

এঙ্গেলস বুর্জোয়া বৈবাহিক প্রতিষ্ঠানের একজন সুতীব্র সমালোচক ছিলেন। কিন্তু তিনি এই প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক উৎস সম্পর্কে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে এই উৎসের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সেই জন্যই তিনি বলেছেন, আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল না এবং ভবিষ্যতে যে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানেও চলতি বৈবাহিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটবে।

এটা স্মরণে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, এটা এখনও ঘটেনি। কোথাও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নও চরিত্রের দিক থেকে ছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সাম্যবাদী সমাজ নয়।

লেনিনের চেয়ে অন্য কারও পক্ষে এ সত্যিটা বোঝা সম্ভব নয়। সাম্যবাদী সমাজ, তাঁর দৃষ্টিতে ছিল অনেক অনেক দূরবর্তী লক্ষ্য। সোভিয়েত রাষ্ট্র যদিও ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতে পারেনি, কিন্তু বহু ব্যক্তিগত মালিকানা এবং শিল্প ও কৃষিতে মানুষের শোষণের অবসান ঘটাতে সমর্থ হয়েছিল।

জন্মলগ্ন থেকেই সোভিয়েত রাষ্ট্রকে বাইরের ও ভেতরের শত্রুদের হুমকির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও লেনিন বিপ্লবের পরপরই সোভিয়েত রাষ্ট্রে মহিলাদের মর্যাদা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। ১৯২০ সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে একাধারে দুর্ভিক্ষ ও ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ চলছিল , সে সময় লেনিন মহান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেট কিনের সঙ্গে মহিলাদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা সংগঠিত করেন। লেনিন দৃঢ়ভাবেই

বলেছিলেন মহিলাদের পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতেই হবে। মুক্ত করতে হবে গৃহবন্দি দশা থেকে এবং গৃহস্থালির একঘেয়ে কাজ থেকে। শিশুলালন কেন্দ্র, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান এবং সবক্ষেত্রে মহিলাদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে উদ্যোগ নিতে হবে। বলশেভিক পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের সহায়তায় লেনিনের এই চিন্তা কার্যকরী রূপ পায়।

১৯২৩ সালের সোভিয়েত সংবিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নের মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। তখনও বিশ্বের কোনও দেশেই মহিলাদের ভোটাধিকার ছিল না। এই আইনে দাম্পত্য জীবনসহ সব ক্ষেত্রে মহিলাদের সমানাধিকার আইনি স্বীকৃতি পেল। অভূতপূর্ব আরও একটি পদক্ষেপ গৃহীত হলো। তথাকথিত বৈধ ও অবৈধ সন্তানদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো সংবিধানে। এইসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে তথাকথিত উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির দশকেরও বেশি সময় লেগেছিল। মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার, উত্তরাধিকার এবং বিবাহ বিচ্ছেদ চাওয়ার সমানাধিকার আইনি স্বীকৃতি পায়। এগুলি ছিল বিপ্লবী পদক্ষেপ।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কেউ বিবাহ বিচ্ছেদ চাইতে পারেন। তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলা ও সন্তানরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অসম সমাজে এ ধরনের আইনকে 'সমানাধিকার' বলে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু সমাজে সবচেয়ে অসম যারা তারাই বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে কারণেই পুঁজিবাদী সমাজে সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার যারা সেই মহিলাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য আইন প্রণয়নের দাবি জানানো হয়।

যেমনটি আগে বলা হয়েছে, সাম্যবাদ অর্থাৎ সম্পূর্ণ মুক্ত সমাজ, যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না, থাকবে না কোনও ধরনের শোষণ— এ ধরনের সাম্যবাদী সমাজ এখনও পৃথিবীর কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও নির্মম শোষণ পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার দৃষ্টান্ত বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। ফলে পৃথিবীর অনেক দেশে মহিলাদের অধিকার ও স্বশাসন সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত হচ্ছে, খর্বিত হচ্ছে সর্বত্র। এ অবস্থায় মহিলাদের সব আইন থেকে মুক্তি নয়, দরকার আরও সুরক্ষার আইন। বিবাহিতা মহিলারা ঘরে - বাইরে হিংসা ও যৌন নির্যাতনের শিকার যাতে না হন তার জন্য আইনি বৈধতা প্রয়োজন। শ্বশুরবাড়ি থেকে তাদের রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলা আটকাতে উপযুক্ত আইন ও তার প্রয়োগ দরকার। স্ত্রী ও সন্তানের জন্য খরপোষ ও আশ্রয়ের বন্দোবস্ত না করে বিবাহিতা মহিলাদের বিচ্ছেদ আটকাতে আইন দরকার। নারী আন্দোলন সর্বত্র আজ এসব আইন প্রণয়ন ও কঠোরভাবে আইনি ধারা প্রয়োগের দাবি জানাচ্ছে।

যদি অবশ্য দু'জন ব্যক্তি মনে করেন যে তারা একসঙ্গে থাকার সম্পর্কে আবদ্ধ হবেন তাহলে তাতে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এমনকি এ ধরনের সম্পর্কেও মহিলারা

যাতে হিংসার বলি না হন, নিরাশ্রয় না হন, অনাথ না হন সেটা সুনিশ্চিত করার দাবি তুলতে হবে। এসব অধিকার রক্ষায় অনেক জায়গায় আইন রয়েছে। যেখানে নেই সেখানে মহিলাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য আইন প্রণয়নের দাবি উত্থাপিত হচ্ছে।

সাম্যবাদী সমাজ ভবিষ্যতের সমাজ। বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, খরপোষ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার রক্ষার নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকবে সাম্যবাদী সমাজে। কিন্তু সে পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকলে চলবে না। মহিলাদের স্বার্থ রক্ষায় যেসব আইন রয়েছে সেগুলিকে আরও শক্তিশালী করা এবং বহু ধরনের সম্পর্ক (স্বামী -স্ত্রী, বাবা- মা এবং শিশু ছাড়াও) অন্তর্ভুক্ত করে আইনের পরিধি ও এক্তিয়ার বাড়ানোর জন্য দাবি জানাতে হবে।

প্রশ্ন: বাম দল ও গণতান্ত্রিক দলের মধ্যে পার্থক্যটা কি? কাদেরকে বাম দল, কাদেরকে গণতান্ত্রিক দল বলব? বিজয়কান্তের ডি এম ডি কে এবং জি কে ভাসানের তামিল মানিলা কংগ্রেসকে কি গণতান্ত্রিক দল বলা যায়? যদি তা না হয় তবে এদেরকে কোন্ পর্যায়ভুক্ত করা হবে?

উত্তর: বাম দল ও গণতান্ত্রিক দলের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে বাম দলগুলি কোনও না কোনও ধরনের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত লক্ষ্য স্থির করে কাজ করে। অবশ্য মার্কসবাদ অনুসরণ করা কিংবা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাটা বাম দল হওয়ার জন্য আবশ্যিক শর্ত নয়। তবে বামপন্থীদের কর্মসূচির মধ্যে সামন্ততন্ত্র বিরোধী, একচেটিয়া পুঁজি বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার উপাদান অতি অবশ্যই থাকতে হবে, সামাজিক ন্যায়ের (জাতপাত ও লিঙ্গ বৈষম্য বিরোধী) জন্য সংগ্রামের উপাদানও তাতে থাকতে হবে। অধিকন্তু একটি বাম দলকে শ্রমিকশ্রেণী, গ্রামীণ গরিব জনগণ এবং শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন অংশের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। ফলে মার্কসবাদী - লেনিনবাদী পার্টি থেকে শুরু করে বামপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি পর্যন্ত নানা ধরনের বাম দলের অস্তিত্বের সুযোগ রয়েছে।

গণতান্ত্রিক দলের ক্ষেত্রে এসব কথা খাটে না। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুতে যারা গণতান্ত্রিক অবস্থান গ্রহণ করে, তাদেরকে গণতান্ত্রিক দল বলে আখ্যায়িত করা যায়। গণতান্ত্রিক অধিকারের সপক্ষে এরা অবস্থান নেয়। শ্রেণীগত বিচারে গণতান্ত্রিক দলগুলি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অথবা পেটি বুর্জোয়া বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু কোনওভাবেই এরা বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে না। প্রাথমিকভাবে বলা যায় কোনও একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কে কী ধরনের ভূমিকা নিচ্ছে তার উপর

ভিত্তি করে কোন্টা গণতান্ত্রিক দল, কোন্টা নয়— তা বিবেচনা করতে হবে। যেমন, ভারতীয় পরিস্থিতিতে কোনও আঞ্চলিক দল যদি সাম্প্রদায়িক বিজেপি-র সঙ্গে আঁতাত করে তবে সেই দল গণতান্ত্রিক ভূমিকা পালন করছে বলে বিবেচিত হতে পারে না।

বর্তমানে আমাদের দেশে জাতীয় স্তরে কোনও গণতান্ত্রিক দলের অস্তিত্ব নেই। বেশিরভাগ আঞ্চলিক দলই এখন যে ভূমিকা নিচ্ছে তাকে গণতান্ত্রিক বলা চলে না। এদের একাংশ ১৯৮০-র দশকে যে গণতান্ত্রিক ভূমিকা নিয়েছিল বর্তমানে তা অনুপস্থিত।

তামিলনাড়ুর যে দুটো রাজনৈতিক দলের কথা প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের আঞ্চলিক দল বলা গেলেও উপরোক্ত অবস্থানের নিরিখে তাদেরকে গণতান্ত্রিক দল বলা চলে না। এ ধরনের পার্টিগুলির চরিত্রগত মূল্যায়ন স্থায়ী নয়। আজ তারা যে ভূমিকায় অবতীর্ণ আগামীতে এর কোনও পরিবর্তন ঘটবে না তা বলা যাবে না। আঞ্চলিক দলগুলি আজ যারা গণতান্ত্রিক ভূমিকা নিচ্ছে না, ভবিষ্যতে তারা গণতান্ত্রিক ভূমিকা নেবে না— এই উপসংহারে যাওয়া ভুল। ডি এম ডি কে কিংবা তামিল মানিলা কংগ্রেসের এই চরিত্রায়ণের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাতকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট কিন্তু কোনও নির্বাচনী জোট নয়।

২১ তম পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে বাম গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এমন কিছু গণতান্ত্রিক শক্তি রয়েছে যাদের কোনও দলীয় অভিব্যক্তি নেই। যেমন ধরুন আঞ্চলিক দলসহ বিভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষ বুর্জোয়া পার্টির অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে। এমন বেশ কিছু গণতান্ত্রিক সংগঠনও রয়েছে যারা শ্রমজীবী জনগণ, মহিলা, দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু প্রভৃতি অংশের জনগণের স্বার্থরক্ষায় গণসংগ্রাম পরিচালনা করে, এইসব শক্তিকে যুক্ত সংগ্রামে টেনে আনা ও সর্বসম্মত রাজনৈতিক ইস্যু ও জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ প্রচার চালানোর জন্য আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে। একটি বিকল্প কর্মসূচির ভিত্তিতে এসব শক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে।

প্রশ্ন : আমাদের পার্টি লিঙ্গ-সমতায় বিশ্বাসী। আইন সভায় নারীদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের পক্ষে আমরা দাবি করে আসছি। আমরা আপ- কে সমালোচনা করছি তাদের মন্ত্রিসভায় একজনও মহিলা না রাখার জন্য। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তগ্রহণকারী স্তরে মহিলা প্রতিনিধিত্বের কথা উঠলে দেখা যায় আমরা অন্যান্য দল থেকে আলাদা নই। অবশ্য, পার্টির সর্বোচ্চ স্তরে প্রতীকী মহিলা প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দিয়ে আমরা করুণা দেখিয়েছি। আমরা যদি মনে করি যে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো প্রয়োজনীয় দক্ষতা

মহিলা কমরেডদের অনেকের মধ্যে তৈরি হয়নি, তা হলে আমরাও অন্যান্য দলের পুরুষদের চাইতে ভিন্ন বলে দাবি করতে পারি না। সমাজে নারীদের উপযুক্ত মর্যাদার আসনে বসাতে কবে গিয়ে আমরা এই চিন্তার বাস্তব রূপ দিতে পারব?

উত্তর : সি পি আই (এম) লিঙ্গ-সমতার জন্য সংগ্রামে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পার্টি সংগঠনের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য। পার্টিতে বেশি সংখ্যায় মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পার্টির সচেতন প্রয়াস রয়েছে। সবস্তরে মহিলাদের পদোন্নতির জন্যও পার্টির উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। পার্টিতে যে পুরুষতান্ত্রিক প্রবণতা ও পুরুষ আধিপত্য রয়েছে, এ সম্পর্কে আমরা সচেতন এবং এই ধরনের প্রবণতার বিরুদ্ধে আমরা নিরন্তর লড়াই চালিয়ে আসছি। শুদ্ধিকরণ অভিযানেও এই বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। এসব ভুল প্রবণতা সংশোধন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

মহিলাদের বেশি সংখ্যায় পার্টিতে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত বিগত পার্টি কংগ্রেসগুলিতে গৃহীত হয়েছে। এখন দেখা যাক গত ২০ বছরে এই সিদ্ধান্ত কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে। ১৯৯৫ সালে মোট পার্টি সভ্যের মাত্র ৫.৫ শতাংশ ছিলেন মহিলারা। ২০১৪ সালে এই হার বেড়ে হয়েছে ১৪ শতাংশ। বেড়েছে, কিন্তু এখনও এই হার কম ও সন্তোষজনক নয়। পার্টির মূল নীতি নির্ধারক কমিটিতে মহিলা প্রতিনিধিত্ব কিছুটা বেড়েছে। ১৯৯৫ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির মাত্র ৫ শতাংশ ছিলেন মহিলা। এখন এই হার ১৫ .৪ শতাংশ। ১৯৯৫ সালে পলিট ব্যুরোতে কোনও মহিলা কমরেড ছিলেন না। এখন দু'জন রয়েছেন। তেমনিভাবে রাজ্য কমিটিগুলিতে মহিলা প্রতিনিধিত্ব বেড়েছে, যদিও এখনও তা অপর্যাপ্ত।

বিভিন্ন শ্রেণী ও গণসংগঠনে লক্ষ লক্ষ মহিলা রয়েছে। এদের মধ্য থেকে পার্টিতে আনার কাজটি যদি শ্লথ হয়, বিভিন্ন স্তরের পার্টি কমিটিতে যদি পর্যাপ্ত সংখ্যায় মহিলা প্রতিনিধিত্ব না থাকে, তবে এটা পার্টির সিদ্ধান্ত কিংবা নির্দেশিকার ঘাটতি নয়। মহিলাদের ক্ষমতা ও লিঙ্গ-সমতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পার্টি কমিটিগুলির যথাযথ উপলব্ধি দরকার।

প্রশ্ন : কমিউনিস্ট পার্টির দুর্ভাগ্যজনক বিভাজনের পর দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় দুটি বড় কমিউনিস্ট পার্টির সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা কোথায়?

উত্তর : ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজনের পেছনে ছিল কর্মসূচি ও নীতিমালা সম্পর্কিত প্রশ্নে দীর্ঘ মেয়াদি আন্তঃপার্টি সংগ্রাম। মতাদর্শগত বিষয়েও মতভেদ ছিল। সংশোধনবাদী পথ থেকে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে উদ্ধার করার প্রয়োজনীয় কর্তব্য সামনে রেখেই সি পি আই (এম) গঠিত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে ১৯৮০'র দশকের শুরু থেকে জাতীয় স্তরে বাম ঐক্য গড়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এর অগ্রগতি ঘটেছে। বর্তমানে নয়া উদারবাদী অর্থনীতি ও সাম্প্রদায়িক শক্তির আগ্রাসনের পরিস্থিতিতে বাম ঐক্য জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বামঐক্যের সম্প্রসারণও জরুরি। সি পি আই (এম) ও সি পি আই বর্তমান পরিস্থিতিতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে। বামঐক্য সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দুই পার্টির মধ্যে মতাদর্শগত ও কর্মসূচিগত যে পার্থক্য রয়েছে সেসবের সমাধানই একমাত্র দুই পার্টির মিলন ঘটাতে পারে। সে সময় পর্যন্ত উভয়ের যুক্ত কার্যক্রম, যৌথ আলোচনা ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা চালিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন:বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বাম দলগুলি একা লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন? এ নির্বাচনে বিজেপি'র বিরুদ্ধে একটা ব্যাপকতর ধর্মনিরপেক্ষ জোট গড়ে লড়াই করা প্রয়োজন ছিল না কি?

উত্তর : বিহারের নির্বাচনে এবং দেশের সর্বত্র বিজেপি'র বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সি পি আই (এম) খুবই সচেতন। ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির সুরক্ষায় এর প্রয়োজন রয়েছে। অবশ্য এটাও স্মরণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে বিজেপি ও সংঘ পরিবারের সদস্যরা যেমন রাজনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে গভীরভাবে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ঘটিয়ে চলেছে তেমনি একই সঙ্গে, গরিব বিরোধী এবং কর্পোরেট ও জমিদারদের স্বার্থরক্ষার নীতিমালা কার্যকর করে চলেছে। বিজেপি প্রকৃতপক্ষে নয়া উদারবাদের সবচেয়ে আগ্রাসী ও একরোখা দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই বিজেপিকে প্রতিহত করতে গেলে বিজেপি'র সাম্প্রদায়িক নীতির বিরুদ্ধেই শুধু নয়, লড়তে হবে শ্রমিক, কৃষক, দলিত আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের জীবন- জীবিকার উপর চলমান আক্রমণের বিরুদ্ধেও। এর জন্য এইসব অংশের জনগণের একটা বড় অংশকে সমবেত করতে হবে। তা হলেই এই সংগ্রাম প্রকৃত অর্থেই বিজেপি'র বিরুদ্ধে সফল কার্যকরভাবে পরিচালিত হবে।

বিহারে বিজেপি বিরোধী প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হচ্ছে জে ডি (ইউ)- আর জে ডি- কংগ্রেস জোট। কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আই (এম)'র কোনও ধরনের নির্বাচনী সমঝোতা হতে পারে না। কারণ এই কংগ্রেস দলই নয়া আর্থিক উদারনীতি কার্যকর করেছে, ব্যাপক দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটিয়েছে এবং সরকারি সহায়তায় কর্পোরেটদেরকে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুটের ব্যবস্থা করেছে। উপা সরকারের উপর এই ক্ষোভ ও অবিশ্বাস থেকেই তো ২০১৪ সালের নির্বাচনে বিজেপি জয়ী হতে পেরেছে। বিজেপি'র জয়ের পেছনে এটাই মুখ্য কারণ। গত দু' দশকে আর জে ডি ও জে ডি (ইউ)'র মতো আঞ্চলিক

দলগুলির ভূমিকা সম্পর্কেও আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে। এই দলগুলির কেন্দ্রে ও রাজ্য সরকারে থাকার সময় নয়া উদারবাদী কর্মসূচির সংরক্ষণ ও রূপায়ণ করেছে। জে ডি (ইউ) তো এন ডি এ সরকারের শরিকই ছিল এবং ক'দিন আগে পর্যন্ত বিজেপি- কে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যে জোট সরকার পরিচালনা করেছে। এইসব নীতি রূপায়ণের ফলে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জাতপাতের স্লোগান যা কিনা এরা প্রকাশ্যে উত্থাপন করেছে। শুধু তাই নয়, সমাজ বিরোধী ও মাফিয়াদের আশ্রয় ও প্রশ্রয়দান বিহারে ভয়াবহ আকার নিয়েছে। অতীতে আমরা এ-ও দেখেছি যে এই দলগুলি বিহারে বিজেপি-র শক্তি বৃদ্ধিকে সহায়তা করেছে। এদের পরিচালিত রাজ্য সরকার ভূমি সংস্কারের ন্যূনতম পদক্ষেপ গ্রহণেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে। অথচ এটি গ্রামীণ পরিষদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসাবে বিবেচিত।

২১ তম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রণকৌশলে সাম্প্রদায়িকতা ও নয়া উদারবাদী নীতি প্রতিহত করতে পার্টির নিজস্ব শক্তির বিকাশ ও বাম ঐক্যকে সম্প্রসারিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিহারে এটাই করা হচ্ছে। গত বিধানসভা নির্বাচনেও সি পি আই (এম), সি পি আই ও সি পি এম (এম এল) ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনী লড়াই সংগঠিত করেছিল।

বাম দলগুলি ইতোমধ্যে নানা ইস্যুতে যুক্ত গণসংগ্রাম সংগঠিত করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক মারা নীতি'র, নয়া জমি অধিগ্রহণ আইন এবং রাজ্য সরকারের গরিব বিরোধী নীতিমালার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ তুলেছে। এই গণসংগ্রামের পর্বটি শেষ হয়েছে ২১ জুলাই বামজোট আহূত সফল বিহার বন্‌ধের মধ্যে দিয়ে।

বাম জোটই একমাত্র জনগণের ইস্যু নিয়ে নির্বাচনে লড়ছে। ভূমিসংস্কার, দলিত ও নারীদের উপর নির্যাতন, শ্রমজীবী জনগণের অধিকার, শক্তিশালী গণতান্ত্রিক বাতাবরণ এবং গুণ্ডারাজ, সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাতের বিভাজন ইত্যাদি ইস্যুতে বামজোট নির্বাচনী প্রচারাভিযান সংগঠিত করবে।

বিজেপি ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে পরাস্ত কর, জাতপাতের রাজনীতি ও নয়া উদারবাদী নীতির বিরোধিতা কর এবং বিধানসভায় বামপ্রতিনিধিত্ব বাড়াও— এই তিনটি স্লোগান নিয়ে বামজোট নির্বাচনী লড়াই সংগঠিত করবে।

প্রশ্ন : (ক) আমাদের পার্টির পলিট ব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির সভাগুলি দিল্লির বাইরে, উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে, যেমন, জয়পুর, ভোপাল, সিমলা, পাটনা ইত্যাদি স্থানে করা যায় না? এটা করলে আমাদের স্থানীয় পার্টি সভ্যরা যেমন উৎসাহিত হবে,

তেমনি প্রচার মাধ্যমেও প্রচার পাওয়ার সুবিধা হবে।

(খ) সি পি আই (এম) কেন রাজস্থান ও হিমাচল প্রদেশের মতো রাজ্যগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে না? এসব রাজ্যে আমরা সফল হতে পারি এবং সামনের বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'লাল রাজস্থান' নামে একটা বিশেষ প্রচারাভিযান সংগঠিত করতে পারি না কি?

(গ) বিজেপি সরকারের এতো সব কেলেঙ্কারি সত্ত্বেও সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে আমরা ভালো ফল করতে পারলাম না কেন?

উত্তর : ক. দিল্লির বাইরে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই, আগরতলা, কোচিন ও ভুবনেশ্বরে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য দীর্ঘ সময় ধরে উত্তর ভারতের কোনও শহরে এটা অনুষ্ঠিত হয়নি। আপনার প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

খ. গণসংগঠন ও পার্টি সংগঠন বাড়াবার জন্য রাজস্থান ও হিমাচল প্রদেশের প্রতি পার্টির মনোযোগ রয়েছে। তবে, 'লাল রাজস্থান' আওয়াজ তোলার সময় এখনও আসেনি। বিধানসভায় সি পি আই (এম)'র প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর স্লোগানই বাস্তবসম্মত হবে।

গ. রাজস্থানে পার্টির গণভিত্তি প্রধানত গ্রামীণ এলাকায়। সে কারণে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পুর নির্বাচনে পার্টির খারাপ ফল হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে কয়েকটি নগর ও শহরে অতি ছোট আকারে পার্টির অস্তিত্ব রয়েছে। এ অবস্থায় শহরের নির্বাচনে ভালো ফলাফল আশা করা যায়না।

প্রশ্ন : কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মীরা বিভিন্ন গণসংগঠন থেকে উঠে আসে। অনেক প্রতিভাধর নেতা ছাত্র-যুবফ্রন্ট থেকে উঠে এসেছেন। বয়স বেড়ে গেলে তারা ছাত্র-যুবফ্রন্ট ছেড়ে অন্যান্য গণফ্রন্ট, বিশেষ করে শ্রমিক ও কৃষকফ্রন্টের কাজে নিয়োজিত হন। ইতোমধ্যে তারা যেহেতু পার্টির নেতৃত্বে চলে এসেছেন, তাই শ্রমিক, কৃষকফ্রন্টেও তারা নেতৃত্বে চলে আসেন। কিন্তু শ্রমিক-কৃষক ফ্রন্টের একই রকমের প্রতিভাধর কর্মীরা ওইসব ফ্রন্টের ও পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বে আসতে পারেন না।

এই সমস্যার কীভাবে সমাধান করা যায়? এ নিয়ে পার্টির ভাবনা-চিন্তাই বা কী?

উত্তর : কমিউনিস্ট পার্টির একটি ক্যাডার পলিসি থাকে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন গণসংগঠনের দক্ষ ও রাজনৈতিকভাবে সুশিক্ষিত নেতৃস্থানীয় কর্মীদের পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে তুলে আনা হয়। এদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আসে ছাত্র-যুবফ্রন্ট থেকে। কারণ পার্টিতে নিয়মিতভাবে তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এর অর্থ এই নয় যে, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক ও কৃষি শ্রমিক ফ্রন্টের কর্মীদের প্রতি পার্টি উদাসীন থাকবে, কিংবা তাদের

অবহেলা করবে। বরং, মৌল শ্রেণিগুলি থেকে কর্মী তুলে আনার জন্য পার্টিকে বিশেষ জোর দিতে হবে এবং পার্টি শ্রেণীবিন্যাস ও পার্টির বিভিন্ন স্তরের কমিটিতে এর যথাযথ প্রতিফলন ঘটানোর জন্য সযত্ন প্রয়াস চালাতে হবে। বিভিন্ন পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্টে এই কাজে দুর্বলতা চিহ্নিত হয়েছে। সর্বক্ষণ কর্মীদের মৌল চাহিদা পূরণে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভাতা দেওয়ারও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। সংশ্লিষ্ট পার্টি কমিটিগুলিকে শ্রমজীবী অংশের কর্মীদের তুলে আনা ও তাদের মানোন্নয়নের জন্য বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। আসন্ন সাংগঠনিক প্লেনামেও এ নিয়ে আলোচনার সুযোগ থাকবে।

প্রশ্ন: আমাদের পার্টি জাতব্যবস্থার অবসান চায়। এটা ঠিক যে দলিতদের মুক্ত না করতে পারলে জাতব্যবস্থার অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। কিন্তু একইসঙ্গে অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণেরও কিছু সঙ্গত সমস্যা আছে। আমাদের পার্টির দলিলপত্রে কখনওই কিন্তু অনগ্রসর সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা হয় না। মনে হয় এরা যেন পুঁজিপতি ও জমিদারদের মতোই আমাদের শত্রু। অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলোর সমস্যা সম্পর্কে পার্টির এই নীরবতা, কিংবা তেমন কিছু না বলা —এর কারণ কি?

উত্তর: পার্টি সব ধরনের জাতব্যবস্থার অবসান চায়। সব ধরনের বৈষম্যের বিলোপ চায়। পার্টির প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে জাতব্যবস্থা উৎখাত করা। জাতব্যবস্থায় তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত। সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার। কারণ, এরা উঁচু বর্ণব্যবস্থার বাইরে বলে বিবেচিত হয়। স্বাধীনতা ও সংবিধান গ্রহণের সাত দশক পরও ভারতে জাতব্যবস্থার মৌলিক কাঠামোর কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। সংবিধানে বলা হয়েছে সব নাগরিক সমান অধিকার ভোগ করবে। অথচ, জাতব্যবস্থার জন্য দলিত ও উপজাতিরা আজও সবচেয়ে বেশি পরিমাণে নানা ধরনের নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার। দলিত ও উপজাতিদের ওপর যে ধরনের নিপীড়ন ও বৈষম্য চলে, তা অন্যান্যদের ওপর সামাজিক নিপীড়নের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সে কারণে পার্টি দলিত ও উপজাতিদের ওপর চলমান সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামকে বিশেষভাবে সামনে তুলে ধরতে চায়।

অনগ্রসর শ্রেণী বা সম্প্রদায়গুলিও যুগ যুগ ধরে চলা জাতব্যবস্থার যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে। পিষ্ট হচ্ছে বিশেষ করে সামাজিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতার প্রশ্নে। সে কারণেই সি পি আই (এম) শিক্ষা ও চাকরিতে ও বি সি সংরক্ষণের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল।

তবে এটাও ঘটনা যে, ও বি সি-দের নিজেদের মধ্যেই বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে। পুঁজিবাদের বিকাশ ও অন্যান্য সামাজিক- অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে অনগ্রসর সম্প্রদায়

বলে পরিচিতদের একাংশ জমির উপর প্রভুত্ব ও আর্থিক প্রতিপত্তির প্রশ্নে সমাজে আধিপত্যকারী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ও বি সি-দের মধ্যে এ ধরনের একটি ক্ষমতাবান অংশ আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উঁচু মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়েছে, যখন ও বি সি-দের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকারী অংশের দেশের কিছু অঞ্চলে দলিত ও আদিবাসীদের ওপরও শোষণ ও নিপীড়ন চালানোর ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়।

এজন্যই সি পি আই (এম) ও বি সি সংরক্ষণের প্রতি সমর্থন ও অন্যান্য ধরনের সামাজিক অসাম্য দূর করার পক্ষে দাঁড়ানোর পাশাপাশি ও বি সি-দের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুসমঞ্জস জনগোষ্ঠী বলে বিবেচনা করে না।

কিছু রাজ্যে ও বি সি-দের মধ্যে আরও বিন্যাস করা হয়েছে ,যেমন সবচেয়ে অনগ্রসর কিংবা চূড়ান্ত অনগ্রসর। সংরক্ষণ ও অন্যান্য সুবিধাদি ও বি সি-দের মধ্যেকার অধিকতর গরিব ও নিপীড়িত অংশের কাছে পৌঁছানো সুনিশ্চিত করতেই এই বিন্যাস করা হয়েছে। সি পি আই (এম) এই পদ্ধতিকে সমর্থন করে।

সি পি আই (এম) ও বি সি সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও চাকরিতে সংরক্ষণ ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মানদণ্ডের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। সামাজিক আর্থিক বিকাশ ও নানা পরিবর্তনের ফলে ও বি সি-দের মধ্যে একটি উচ্চবিত্ত অংশ তৈরি হয়েছে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই যারা গরিব অংশের লোক এসব সরকারি সুযোগ- সুবিধা তাদের কাছে পৌঁছে না। এ কারণেই আর্থিক মানদণ্ডের কথা বলা হয়েছে। এই নীতির ভিত্তিতেই সুপ্রিম কোর্ট 'ক্রিমিলেয়ার' বা উচ্চবিত্ত অংশকে সংরক্ষণের আওতার বাইরে রেখেছে।

সি পি আই (এম) মনে করে অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির একটা বড় অংশ হচ্ছে গরিব কৃষক, কায়িক শ্রমিক ও গ্রাম -শহরের গরিব মানুষ। সি পি আই (এম) তাই সামাজিক ইস্যুর সঙ্গে শ্রেণীগত ও আর্থিক দাবি-দাওয়ার সংগ্রামকে এক সুতোয় গেঁথে ওবি সি জনগণের মধ্যে সংগ্রাম পরিচালনায় সচেষ্ট রয়েছে।

প্রশ্ন: সম্প্রতি দু'জন মুসলিম মহিলা, মুসলিম সমাজে একলপ্তে তিনবার "তালাক" উচ্চারণের মাধ্যমে একতরফা বিবাহ বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন। সুপ্রিম কোর্ট তাদের আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করে— তাদের রায় ঘোষণার আগে কেন্দ্রীয় সরকারকে এ বিষয়ে সরকারের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দেয়। এই বিষয়ে সি পি আই (এম)-র অবস্থান কি?

উত্তর: ভারতের সংবিধানে নারী - পুরুষ নির্বিশেষে সাম্যের অধিকার বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। কাজেই দেশের কোন নাগরিক যদি মনে করেন, লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে তার অধিকার খর্ব হচ্ছে, তবে তিনি তার অধিকার হরণের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে প্রতিকার চাইতে পারেন। ঐসলামিক বিচার বিধির একজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ তাহীর মহম্মদ বার বার যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন তা হলো, বিভিন্ন ধর্মীয় প্রচলিত বিধানসহ কোন সামাজিক বিধি যদি সংবিধানের কোন ধারার পরিপন্থী হয় এবং এর ফলে কোন ভুক্তভোগী সুবিচার চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করলে সুপ্রিম কোর্ট এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য।

সুনির্দিষ্ট যে বিষয়টির কথা এখানে বলা হচ্ছে ঐসলামিক রীতিনীতি সম্পর্কে, বিশেষ মত, একদলের বক্তব্য হলো: একই সময়ে তিনবার এক তরফা " তালাক" উচ্চারণের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ কার্যকর করা তীব্রভাবে নিন্দনীয় এবং এ ধরনের বিবাহ বিচ্ছেদ গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের দাবি, বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য কোরানে বর্ণিত যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে যাতে সংশ্লিষ্ট স্বামী বিচ্ছেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে যথেষ্ট ভাবনা - চিন্তার সুযোগ পায় এবং এই উদ্দেশ্যে প্রথম ও তৃতীয় তালাকের মাঝে অন্তত দুই মাস সময়ের ব্যবধান রাখা হয়েছে।

শাহ বানু বিতর্কের অব্যবহিত পরই " সমানাধিকার ও আইনের সমপ্রয়োগ" এই বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত একটি কনভেনশনে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি একটি প্রস্তাবে দাবি উত্থাপন করে যে, সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের নাগরিকদের লিঙ্গগত সমানাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। প্রস্তাবে এই অধিকার কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে এক্ষেত্রে অগ্রগতি খুবই সামান্য। সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি পরবর্তী সময়ে একটি দাবিসনদের ভিত্তিতে সারা দেশব্যাপী স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান সংগঠিত করে। এই দাবিসনদের অন্যতম দাবি ছিল— মুসলিম স্বামীদের এক তরফা তালাক দেয়ার অধিকার বেআইনি ঘোষণা করা।

এটা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক যে বিভিন্ন মুসলিম মহিলা সংগঠন এই সম্প্রদায়ের মহিলাদের লিঙ্গগত সমানাধিকার বজায় রাখার জন্য " মুসলিম পারসোন্যাল ল" সংশোধনের দাবি তুলছে। তাদের এই দাবি মুসলিম সমাজে এবং অমুসলিমদের অনেক অংশের সমর্থন পাচ্ছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) মুসলিম মহিলা সংগঠনগুলির এই উদ্যোগকে সমর্থন করে।

সমস্ত সম্প্রদায়ের নারীদের সমানাধিকারের দাবি সি পি আই (এম) ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। একজন স্বামীর একতরফা একই সময়ে হোক বা তিন মাস সময়ের ব্যবধানে হোক, " তালাক" শব্দটি উচ্চরণ করেই তার স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাবার অধিকার কিছুতেই মেনে

নেয়া যায় না। এই অবস্থায় বিবাহ বিচ্ছিন্ন স্ত্রী প্রতিকারের জন্য ' খুলা'র আশ্রয় নিতে পারেন। তা নিতে গেলেও তাকে মোহর ইত্যাদি অনেক ধরনের অধিকার ত্যাগ করতে হয়। এবং বিশেষ করে কাজীর অনুমোদন নিতে হয়। সি পি আই (এম) মুসলিম মহিলাদের সমানাধিকার নিশ্চিত করতে " মুসলিম পারসোন্যাল ল" সংশোধনের দাবিকে সমর্থন করে।

('খুলা' হল মুসলিম মহিলাদের স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ নেবার অধিকার। আর 'মোহর' হল স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেয়া স্থাবর- অস্থাবর সম্পত্তি ; যার উপর স্ত্রীর একচ্ছত্র মালিকানা স্বত্ত্ব থাকে, এবং স্বামীর অবর্তমানে এই সম্পত্তি অবলম্বন করে স্ত্রী জীবিকা নির্বাহ করে।)

প্রশ্ন: ' ভারতমাতা কী জয়' , একটি জাতীয়তাবাদী স্লোগান— এ সম্পর্কে আপনাদের অবস্থান কী ?

উত্তর: সি পি আই (এম)-র দৃঢ় অভিমত হচ্ছে, ভারতের কোনও নাগরিকের উপর স্লোগান ও অভিনন্দনসূচক বার্তার ক্ষেত্রে কোনও কিছু চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। প্রত্যেক নাগরিকের নিজের পছন্দমতো স্লোগান দেওয়ার অধিকার আছে। ' দেশপ্রেমের পরীক্ষা'-র নামে এই অধিকার খর্ব করা চলবে না। ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী দেশ। তাতে সব নাগরিক সমান অধিকার ও মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী। আমাদের সংবিধানে কোনও নাগরিকের আনুগত্য কোনও বিশেষ পরীক্ষার অধীন করার সুযোগ নেই। কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠী, কিংবা রাজনৈতিক দল যারা এই মৌলিক ধারণায় অবিশ্বাসী, তারা প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সংবিধান ও জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধেই কাজ করছে।

এই প্রেক্ষাপটে ' ভারত মাতা কী জয়' স্লোগানধারীরা তৈরি -করা যে বিতর্ক উপস্থিত করেছে এবং অন্য যারা এই স্লোগান মানতে বাধ্য নয় বলছে তাদের দেশপ্রেমের পরীক্ষা দেওয়ার দাবিকে বিচার করতে হবে। এই বিতর্ক তৈরি করা হয়েছে শুধুমাত্র বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে বিভাজন বাড়াবার জন্য এবং এ উদ্দেশ্যেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে 'বিশ্বাসঘাতক' বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। সংঘ পরিবার ও রামদেবের মতো সংঘ পরিবারের উগ্র সমর্থকরা এই স্লোগান না দিলে তাদের হত্যা ও বিতাড়নের হুমকি সংবলিত অত্যন্ত উসকানিমূলক যে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েছে, তাতে এ সন্দেহই গাঢ়তর হচ্ছে যে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সংখ্যালঘু বিরোধিতার ঘোষিত লক্ষ্য পূরণের জন্যই তারা এসব বিতর্ক উপস্থিত করছে। কংগ্রেস দল, যারা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করে . , সেই দলেরও কোনও কোনও নেতা এমন সব বিবৃতি দিয়েছেন যা সংঘ পরিবারের

আগুনে ঘি ঢালা ছাড়া আর কিছু নয়। সংঘ পরিবার দাবি করেছে মহারাষ্ট্রের এম আই এম বিধায়ক পাঠানকে বহিষ্কার করতে হবে। কারণ পাঠান এই স্লোগান দিতে আপত্তি জানিয়েছেন। এম আই এম নেতা ওয়াসিস, যিনি সাম্প্রদায়িক বিভাজন থেকে নিজের রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে সচেষ্ট রয়েছেন, সেই ওয়াসিসের ঘোষণাও সংঘ পরিবারের হাতকে শক্তিশালী করেছে। ওয়াসিস সাহেব বলেছেন তিনি কোনও দিনও এই স্লোগান দেবেন না। অবশ্য কেউ তার কাছে এই স্লোগান দেওয়ার দাবি জানায়নি।

সংঘ পরিবার ও তার জোট শরিক শিবসেনা কেন 'ভারত মাতা কী জয়' স্লোগানকে দেশপ্রেম পরীক্ষার মানদণ্ড হিসাবে বেছে নিয়েছে? এর আগে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি নিয়েও এরা একই কাণ্ড ঘটিয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বহু নেতা এই ধ্বনিগুলি দিয়েছেন বিধায় দেশের অনেকের কাছেই এসব স্লোগান একটা বিশেষ ভাবাবেগ তৈরিতে সক্ষম। এটা বুঝতে হবে যে যদিও স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের অনেকের মুখে বিশেষ করে বন্দেমাতরম ধ্বনিটি উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু কখনওই তারা জাতীয় আন্দোলনের জন্য কোনও নির্দিষ্ট ধ্বনি নির্বাচন করেননি, এখন সংঘ পরিবার যা করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের অত্যন্ত জনপ্রিয় শহিদ ভগৎ সিং 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছেন। বি জে পি-র বড়দরের নেতা ভেঙ্কাইয়া নাইডু গত কয়েক মাস ধরে বারবার একই মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে চলেছেন যে, ভগৎ সিং নাকি 'ভারত মাতা কী জয়' ধ্বনি দিতে দিতে শহিদ হয়েছেন। এ বিবৃতি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী ও প্রামাণ্য সরকারি নথিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

বঙ্গের নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মুখে উচ্চারিত স্লোগান 'জয়হিন্দ' অন্য দুটি স্লোগানের চেয়ে ভারতবাসীর কাছে অধিক পরিচিতি লাভ করেছে। এই ধ্বনিকেও যথাযথ কারণেই জাতীয় ধ্বনি হিসাবে নির্বাচিত করা হয়নি। নেতাজির সেই ঐতিহাসিক সফরের ঘটনা সবার জানা। সাবমেরিনে চড়ে তিনি জার্মানি থেকে জাপান যাচ্ছিলেন। সে সময় তিনি তার সফরসঙ্গী এক তরুণ আবিদ হাসানকে প্রশ্ন করেন, বলতো কোন্ স্লোগানের মাধ্যমে ভারতীয়দের দেশপ্রেমের আবেগ যথার্থভাবে প্রকাশ পেতে পারে? হাসান বললেন— 'জয়হিন্দ' ধ্বনিটা এ কাজ করতে পারবে। নেতাজি সঙ্গে সঙ্গে এই স্লোগানটি লুফে নেন। এই ধ্বনিই পরে আজাদ হিন্দ ফৌজের ধ্বনি হিসেবে স্বীকৃত হয়। শুধু আজাদ হিন্দ ফৌজ নয়, এই ধ্বনি সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষ কোটি ভারতবাসীর হৃদয়কে উদ্বেলিত করে আসছে। এটা আজ উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর

সরকারি ধ্বনি হিসেবে স্বীকৃত।

জওহর লাল নেহরু এক জায়গায় লিখেছেন — তাঁর এক সভায় উপস্থিত জনতাকে তিনি প্রশ্ন করেন, 'ভারতমাতা'-কে তারা কীভাবে ভাবতে চান। তিনি তখন নিজের ভাবনাটাই জনতার সামনে পেশ করেন। তিনি বলেন, 'ভারতমাতা' হচ্ছে ভারতের জনগণ, বিশেষ করে নিপীড়িত, শোষিত। গরিব অংশের মানুষ ও মহিলারা, যারা স্বাধীনতা ও অধিকারের জন্য সংগ্রাম করে চলেছেন। 'ভারত মাতা'-র এই সংজ্ঞা আজ সংঘ পরিবার যা চাপাতে চাইছে তার থেকে বহুযোজন দূরে। সংঘ পরিবারের 'ভারতমাতা' হচ্ছে একজন দেবী, অবশ্যই তা হিন্দুদেবী।

সি পি আই (এম) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে দেশপ্রেম বিচার করতে হবে কাজের মধ্য দিয়ে, কথা দিয়ে নয়। জনগণের স্বার্থে কাজ করা এবং শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের অধিকারের জন্য সংগ্রাম চালানোর মাধ্যমেই আমরা একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তুলতে পারব। তার জন্য আমাদের সমতা ও গণতন্ত্রের নীতিমালাকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। বিভেদকামী স্লোগান, উগ্র -জাত্যভিমানী জিগির ও আমাদের নাগরিকদের একটি অংশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক তৎপরতার কোন স্থান এখানে থাকতে পারে না।

প্রশ্ন : কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ সমালোচনা হচ্ছে এই যে, তারা ভারতে বর্ণবাদের বাস্তবতা উপেক্ষা করে এবং শুধু শ্রেণী উপাদানের ওপরই জোর দেয়। জাতব্যবস্থা সম্পর্কে সি পি আই (এম)'র অবস্থান কি এবং বর্ণবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পার্টি কী ভূমিকা নিচ্ছে?

উত্তর : জাতব্যবস্থা, বর্ণবাদী নিপীড়ন, জাতের নামে জনজমায়েত, বর্ণবাদী পরিচিতি সত্তা, এবং আন্তঃবর্ণ বিভিন্নতা ইত্যাদি প্রশ্নে কোনও ভারতীয়ই বিশেষ করে কোনও রাজনৈতিক দল, যারা কিনা এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিপীড়িতদের ঐক্যবদ্ধ করতে চায়, তাদের পক্ষে এই বাস্তবতা উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। অস্পৃশ্যদের, স্বাধীনতার আগে থেকেই যারা এই নামে পরিচিত এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের একাংশের ওপর বর্ণবাদী নিপীড়ন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন স্থানে পার্টির ছোট ছোট গোষ্ঠী গঠনের পর থেকেই এমনকি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার আগে থেকেই, প্রচার ও সংগ্রাম সংগঠিত করে আসছে। উঁচুজাতের দ্বারা সমাজের নিচুতলার মানুষদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অস্পৃশ্যতা, হিংসা ও অমর্যাদার প্রশ্ন বিবেচনার বাইরে থাকলে ভূমিহীন ও গ্রামীণ গরিবদের সংগ্রাম সংগঠিত হতে পারত না। এসব শ্রেণী আন্দোলন হতো না যদি মজুরি, প্রজাস্বত্ব ও বন্ধন থেকে মুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর মতো জাতব্যবস্থার অমানবিক চরিত্র কেন্দ্রীয় ইস্যু ইত্যাদি উত্থাপিত

না হতো।

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কমিউনিস্টদের কাছে শ্রেণীর ইস্যুটিই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমাদের মতে শ্রেণীই হচ্ছে প্রধান সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপকার। অনেক সময় গ্রামীণ ও শহুরে শ্রমিকশ্রেণী এবং সামাজিকভাবে নিপীড়িত সম্প্রদায়গুলি একটার গায়ে অন্যটা লেগে থাকে। অন্যদিকে, জমিদার ও পুঁজিপতি শ্রেণীগুলি এবং উঁচুবর্ণের লোকেরা পরস্পর মিশে থাকে। কিন্তু এই মিশে থাকাটা স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় নয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিপতি ও জমিদারশ্রেণী এবং উঁচুবর্গের লোকদের মিশে থাকার মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে। আমাদের দেশে পুঁজিবাদের অসম বিকাশের ফলে সব বর্গের মধ্যেই গরিব মানুষের সন্ধান মেলে। এটা যেমন গ্রামে দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় শহরেও। পুঁজিবাদের অসম বিকাশের ফলস্বরূপ ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান হারে বেকারি ও ভূমিহীনের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তবে রাজনৈতিক ও ভূমি সম্পর্কের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে একটি অংশও পুঁজিপতি ও ধনতান্ত্রিক জমিদারদের শিবিরে প্রবেশ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অনগ্রসর সম্প্রদায়ের একটি অংশ এভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

সুতরাং এটা মনে করা ঠিক হবে না যে আমাদের দেশে শুধুমাত্র জাতপাতের নিপীড়নই শোষণের একমাত্র নমুনা, কিংবা বর্ণবাদী শোষণ, বিশেষ করে দলিতদের উপর পরিচালিত সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছাড়া শ্রেণীশোষণের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম চালানো সম্ভব হবে। আজও গ্রামীণ ভারতে দলিতরাই ভূমিহীনদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। শহুরে শ্রমিকদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে বেশি শোষিত ও গরিব অংশ। এদের অধিকাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন। কমিউনিস্টদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে দলিতদের সামাজিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম চালানো, যাতে অর্থনৈতিক অসাম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে চলমান সংগ্রামে তাদের শামিল করা যায়।

এটা ঘটনা যে, স্বাধীনতা লাভের ৬৮ বছর পরও আমাদের দেশে দলিতরা ভয়াবহ হিংসা ও নির্যাতনের শিকার। তাদের নাগরিকত্বের সমানাধিকার অর্জনের প্রয়াসকে নির্মমভাবে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সব ধরনের সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে কার্যকর সংগ্রাম চালানো কমিউনিস্টদের অগ্রাধিকার। এটা বলা ঠিক নয় যে এই বোঝাপড়ার ওপর দাঁড়িয়ে সি পি আই (এম) কোনও কাজ করছে না।

দেশের বিভিন্ন অংশ যেখানে কমিউনিস্টরা রাজ্য সরকার পরিচালনা করেছে কিংবা করছে, যেমন— কেরালা, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গে, সে সব রাজ্যে দলিতদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে দলিতদের ওপর যে ধরনের নির্যাতন সংগঠিত হয়, এই তিন রাজ্যে

তা ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ (বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা) এবং তামিলনাড়ুতে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ও দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সি পি আই (এম)'র নারী - পুরুষ কর্মীরাই খাপ পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে সামনা সামনি লড়াই চালিয়েছে। দলিতদের উপর নির্যাতন, অসবর্ণ বিবাহ, দলিত মেয়ে ও মহিলাদের ওপর যৌন নির্যাতনের মতো ইস্যুগুলি নিয়ে সংগ্রাম করছে। সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে হিন্দি ভাষাভাষী এলাকায় সংগ্রাম পরিচালনার ওপর পার্টি আরও গুরুত্ব আরোপ করেছে।

প্রশ্ন: একটি মার্কসবাদী পার্টির ধর্মের বিরোধিতা করারই কথা। কিন্তু পার্টির হিন্দি সাপ্তাহিক লোকলহর-র যে সংখ্যাটি আমার হাতে পৌঁছেছে, তাতে (এবং পিপল্‌স ডেমোক্র্যাসিতেও) আমি দেখলাম, 'রোজা- ইফতার' এবং 'শ্রীরাম কলোনিতে ঈদ উৎসব' পালনের সংবাদ বেরিয়েছে। 'বাবরি মসজিদ' নিয়েও আপনারা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। অথচ দেওয়ালি ইস্যুতে দেখলাম আপনারা শ্রেণীসংগ্রামের ডাক দিয়েছেন। তাহলে কি মার্কসবাদী পার্টির ধর্মের বিরোধিতা শুধু হিন্দু ধর্মের আচার- আচরণ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ক্রিয়া- কর্মের বিরোধিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ?

উত্তর: আপনার প্রশ্নে দুটো বিষয় রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে ধর্ম সম্পর্কে সি পি আই (এম)'র দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত। অনেকের মতো আপনিও মনে করেন যে সি পি আই (এম) ধর্মের বিরুদ্ধে। কিন্তু আপনার এ ধারণা সঠিক নয়। আমাদের পার্টি সেই অর্থে ধর্মের বিরোধিতা করে না, যে কোনও ধর্মে বিশ্বাসী মানুষই আমাদের দলের সভ্য হতে পারেন। যদিও আমাদের পার্টির মতাদর্শগত ভিত্তি হচ্ছে মার্কসবাদী দর্শন, যার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, তা হলেও পার্টি সভ্যপদ দেওয়ার পূর্ব শর্ত হিসেবে কাউকে ধর্মীয় বিশ্বাস ত্যাগ করার কথা বলা হয় না। অবশ্য পার্টি সভ্যরা নিজেদের ধর্মের প্রতি অনুরাগকে শুধু ব্যক্তি জীবনেই সীমাবদ্ধ রাখবেন বলে পার্টি আশা করে। পার্টির কর্মসূচি রূপায়ণে ধর্মীয় বিশ্বাসের হস্তক্ষেপ কোনওভাবেই অনুমোদিত নয়।

কমিউনিস্টদের ধর্মের বিরোধিতা প্রকৃতপক্ষে সেখান থেকেই শুরু হয় যখন ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্থাগুলি শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থরক্ষা ও তার অগ্রগতির বিরুদ্ধে ধর্মের অপব্যবহার করতে শুরু করে। কমিউনিস্টরা ধর্মের নামে জনগণকে বিভাজিত করার যে কোনও প্রয়াসের ঘোর বিরোধী, শ্রমজীবী জনগণের প্রকৃত স্বার্থ আড়াল করতে এবং তাদের শ্রেণী চেতনা দুর্বল করার লক্ষ্যে ধর্মকে ব্যবহারের যে কোনও অপচেষ্টার বিরোধিতার কমিউনিস্টরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ধর্মের এই অপব্যবহার

ও বিকৃতির বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের অবস্থান স্পষ্ট। কমিউনিস্টরা চায় সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে সব ধর্মমতের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে। শুধু ব্রাহ্মণ্যবাদ নয় সব ধরনের গোঁড়ামিরই কমিউনিস্টরা বিরোধিতা করে। অন্যদিকে, সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে কমিউনিস্টরা এমনকি ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গেও সহযোগিতা করতে রাজি থাকে, যদি তাদের ভূমিকা এক্ষেত্রে ইতিবাচক হয়। লাতিন আমেরিকায় এমন বহু উদাহরণ রয়েছে যেখানে পরিবর্তনে বিশ্বাসী ধর্মগুরুদের সঙ্গেও কমিউনিস্টরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে। তাই এটা খুব পরিষ্কার যে কমিউনিস্টরা সেই অর্থে ধর্মের বিরোধী নয়।

এখন আপনার উত্থাপিত দ্বিতীয় বিষয়টিতে আসা যাক। পার্টি মুখপত্রে প্রকাশিত দুইটি সংবাদ সম্পর্কে আপনি প্রশ্ন তুলেছেন। কেউ যদি মনোযোগ দিয়ে সংবাদ দুইটি পড়েন তা হলে দেখবেন এগুলি নিছক ঈদ উৎসব পালন কিংবা রোজা- ইফতার আয়োজনের সংবাদ নয়। মার্কসবাদী পার্টি যেমন কারও ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী নয় তেমনি আবার ধর্মীয় উৎসবের আয়োজকও নয়। দিল্লির শ্রীরাম কলোনির ঈদ উৎসবের সংবাদ নিয়ে আপনি প্রশ্ন তুলেছেন। এলাকাটি মুসলিম অধ্যুষিত। আর এস এস ঈদের দিনে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ বাঁধাবার জন্য এখানে তৎপরতা চালাচ্ছিল। ধর্মীয় মেরুকরণের জন্যই এই ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছিল। আর এস এস'র এই ঘৃণ্য পরিকল্পনা আমাদের পার্টি ও পুলিশের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় ভেস্তে গেছে। এটাই ছিল সংবাদটির মুখ্য বিষয়।

তেমনি মুজফ্‌ফরনগরের একতা কলোনির, রোজা- ইফতারের সংবাদের প্রতিও আপনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই কলোনিটি সি পি আই (এম) গড়ে তুলেছে। ২০১৩ সালে সংঘটিত মুজফ্‌ফরনগরের ভয়াবহ দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে নিয়ে এই কলোনি গড়ে উঠেছে। কলোনির বাসিন্দারা সবাই মুসলিম। সংবাদটির উদ্দেশ্য ছিল দাঙ্গা দুর্গতদের জীবনযাত্রা কীভাবে কতটুকু স্বাভাবিক হয়ে আসছে তা তুলে ধরা। হ্যাঁ, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে পার্টির মুখপত্রের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। আসলে ওই সংখ্যাটিতে মসজিদ সম্পর্কে যতটুকু বলা হয়েছে তার চেয়ে বেশি বলার চেষ্টা হয়েছে বিজেপি- আর এস এস'র নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির দ্বারা ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো ও সাংবিধানের ওপর কী জঘন্য ও উলঙ্গ আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল সেদিন! দোষীদের আজও কোন শাস্তি হয়নি। এ বিষয়টি জাতিকে আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছিল।

প্রশ্ন : আচ্ছা, এটা কেমন কথা যারা জেল হাজতে থাকবেন তারা নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন, কিন্তু তারা ভোট দেওয়ার অধিকারী নন? দেশে এ ধরনের প্রায় ৪

লক্ষ মানুষ বিচারের অপেক্ষায় জেল হাজতে রয়েছেন। ২০১৪ সালের ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের সময় এতো সংখ্যক লোককে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এটা কেন হবে? আপনি কী বলেন?

উত্তর : বর্তমান আইন অনুযায়ী যে কোনও ব্যক্তি যিনি জেল হাজতে কিংবা পুলিশ হেপাজতে রয়েছেন, নির্বাচনে তাদের ভোটের অধিকার নেই। এই আইন সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন— উভয় ধরনের বন্দির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৬২(৫) ধারায় ভোটাধিকার হরণের এই সংস্থান রাখা হয়েছে।

বিচারাধীন বন্দি হচ্ছেন তারা, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে এবং জেল হাজতে রয়েছেন, কিন্তু এখনও সাজা হয়নি। ভারতে জেলবন্দি মানুষের ৬৮ শতাংশই হচ্ছেন এ ধরনের বিচারাধীন বন্দি। সংখ্যাটা তিন লক্ষের মতো। তাদের ভোটাধিকারের সুযোগ কেড়ে নিয়ে প্রকৃতপক্ষে তাদের একটি সাংবিধানিক অধিকার থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছে।

আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থার মর্মকথা হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত কারও অপরাধ প্রমাণিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে "নির্দোষ" বলে বিবেচিত হবে। বিচারাধীন বন্দিদের একটা বড় অংশ সমাজের গরিব অংশের মানুষ। তাদের পক্ষে জোরালো আইনি সাহায্য পাওয়ার সুযোগ নেই এবং তারা জামিনও পান না। আর, ভারতের বিচার ব্যবস্থার এতোটাই দুর্নাম রয়েছে যেখানে বিচার চলে অত্যন্ত ধীরে, কচ্ছপের গতিতে। ফলে একটি মামলা শেষ হতে বছরের পর বছর লেগে যায়।

সুতরাং, বিচারাধীন বন্দিদের, তারা জেল হাজতেই থাকুন আর থানা হেপাজতেই থাকুন, ভোটের অধিকার হরণ করা অন্যায় ও অন্যায্য।

দুঃখের বিষয়, সুপ্রিম কোর্ট এই ব্যবস্থার পক্ষেই রায় দিয়েছে। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৬২ (৫) ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে একটি মামলা হয়েছিল। ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে সেই মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে— সাজাপ্রাপ্ত, জেল ও থানা হাজতে থাকা বিচারাধীন বন্দিদের ভোটের অধিকার না থাকাটা যুক্তিসঙ্গত। কারণ হিসেবে রায়ে বলা হয়েছে, রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন রোধে এর প্রয়োজন রয়েছে। অবশ্য এ কথাটা বলা প্রয়োজন ছিল যে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন রোখার সঙ্গে নির্দোষ ব্যক্তিদের, যারা সাজাপ্রাপ্ত নন, তাদের ভোট দেওয়ার নাগরিক অধিকার হরণের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না।

জেলবন্দিদের ভোটাধিকার না দেওয়ার পক্ষে আরও একটি যুক্তি দেখানো হয়েছে।

বলা হয়েছে জেলবন্দিদের ভোট কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে ভোট দেওয়ানোর প্রশ্নটি ব্যয়সাধ্য ও প্রশাসনিক বিশেষ উদ্যোগের প্রয়োজন। এই যুক্তিও অবান্তর। বিচারাধীন বন্দিদের পোস্টাল ব্যালটে ভোটের অধিকার দেওয়া যেতেই পারে। গত বছর সুপ্রিম কোর্ট প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য ই-ভোটিংএর পক্ষে রায় দিয়েছে। বিদেশে থাকা ভারতীয়রা যদি ভোটের অধিকার পেতে পারে, তা হলে এই পদ্ধতি ভারতে থাকা বিচারাধীন বন্দিদের জন্য চালু করা যাবে না কেন?

বিচারাধীন বন্দিরা ভোট দিতে পারবেন না, অথচ এরা জেলে বসে নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন — এটা কেমন কথা হলো? তা হলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারও উচ্চ আদালতের বাতিল করা উচিত ছিল।

২০১৩ সালের জুলাই মাসে সুপ্রিম কোর্টের দুই সদস্যক বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে জেলে থাকা কিংবা থানা হাজতে থাকা কোনও ব্যক্তি আইনপ্রণয়নকারী কোনও সংস্থার নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না। এই রায় নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকারে দারুণভাবে হস্তক্ষেপ করেছে। সাজা হয়নি এমন বিচারাধীন ব্যক্তি কিংবা যিনি কিনা কোনও অভিযোগের ভিত্তিতে থানা হেপাজতে রয়েছেন, যার কোনও বিচারও হয়নি, সাজাও হয়নি, এই ধরনের ব্যক্তিরা শীর্ষ আদালতের নির্দেশে নির্বাচনে দাঁড়াবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন। সি পি আই (এম) এই রায়ের সমালোচনা করে বলেছে এটা ক্ষমতা ফলানো ছাড়া কিছু নয়।

এই রায়ের প্রয়োগ রদে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় সংসদ জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের কিছু সংশোধন করেছে। সংশোধনীতে বলা হয়েছে জেলের বিচারাধীন বন্দিদের নির্বাচনে দাঁড়ানোর অধিকার সুরক্ষিত করা হলো। কিন্তু তাদের ভোটের অধিকার দেওয়া যাচ্ছে না। এটা এক ধরনের বৈষম্য। এই বৈষম্য দূর করা জরুরি।

ফলে দেখা যাচ্ছে জেলে, কিংবা পুলিশি হেপাজতে থাকা বন্দিদের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের সংশোধন করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন: আধার বিলকে অর্থ বিল হিসাবে ঘোষণা করে সংসদের অধিবেশনে পেশ করা হয়েছে। সি পি আই (এম) এর বিরোধিতা করল কেন?

উত্তর: মোদি সরকার লোকসভায় আধার বিল (লক্ষ্যযুক্ত আর্থিক ও অন্যান্য ভরতুকি, সুযোগ ও পরিসেবা বন্টন) পেশ করেছে। সরকারের অনুরোধে লোকসভার অধ্যক্ষ বিলটিকে অর্থবিল হিসেবে পেশের অনুমতি দিয়েছেন। সংবিধান অনুযায়ী কোনও অর্থবিল সংশোধন

বা পরিবর্তন করার অধিকার রাজ্যসভার নেই। রাজ্যসভা কেবল লোকসভার নিকট এ বিষয়ে সুপারিশ করতে পারে। লোকসভাই এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

লোকসভার অধ্যক্ষ আধার বিলকে সংবিধানের ১১০ (৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অর্থবিল হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। অধ্যক্ষের এই সিদ্ধান্ত সংবিধান অনুযায়ী ত্রুটিপূর্ণ। কী ধরনের বিলকে অর্থবিল হিসেবে ঘোষণা করা যাবে তা সংবিধানের ১১০ (১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে। ১১০ (২) ধারায় কোন্‌গুলিকে অর্থবিল হিসেবে ঘোষণা করা যাবে না তার উল্লেখ রয়েছে। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, যে বিল রাজস্ব বাড়ানো কিংবা অর্থ বা পরিসেবা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ের বাইরে তাকে অর্থবিল হিসেবে ঘোষণা করা যাবে না। এই ভিত্তিতে আধার বিলকে অর্থবিল হিসেবে ঘোষণা করা যায় না।

কোনও বিলকে অর্থবিল হিসেবে ঘোষণা করা নিয়ে যাবতীয় বিতর্কের নিষ্পত্তি করার ভার লোকসভার অধ্যক্ষের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। আধার বিলকে অর্থ বিল হিসেবে পেশ করায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। নাগরিকদের গোপনীয়তার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে নাগরিকদের বায়োমেট্রিক পরিসংখ্যান ও কম্পিউটারে সঞ্চিত সুবিন্যস্ত তথ্যাদি ব্যবহার করা নিয়ে। যেহেতু এই বিল নাগরিক অধিকার সুরক্ষার প্রশ্নে গভীর উদ্বেগ তৈরি করেছে সেইহেতু আধার বিলকে অর্থবিল হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে না।

সরকার আধার বিলকে অর্থ বিল হিসেবে লোকসভায় পেশ করতে গেল কেন? কারণ, রাজ্যসভায় সরকার পক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। রাজ্যসভাকে এড়ানোর জন্যই এটা করা হয়েছে। রাজ্যসভার নেতা অরুণ জেটলি সাম্প্রতিক অতীতে বলেছেন, লোকসভাই হচ্ছে সর্বেসর্বা। বিল পাসের বিষয়ে রাজ্যসভার ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা থাকতে পারে না। এই যুক্তি সাংবিধানিক ব্যবস্থাপনার পরিপন্থী। লোকসভা ও রাজ্যসভার যে ক্ষমতা সংবিধান দিয়েছে জেটলির বক্তব্য তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

সি পি আই (এম), তাই অসাংবিধানিক এই তৎপরতার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছে। বলেছে— আধার বিল কখনই অর্থ বিল বলে ঘোষিত হতে পারে না। আধার বিলকে অর্থবিল ঘোষণা দিয়ে লোকসভার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা চেয়ে শীর্ষ আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে।

প্রশ্ন: রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধারাটি আপত্তিকর কেন? দেশের ভেতরে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি যখন তৎপর রয়েছে তখন আমাদের পার্টি কেন রাষ্ট্রদ্রোহিতা সংক্রান্ত আইনের

বিরোধিতা করছে?

উত্তর: রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারায় শাস্তির বিধান রয়েছে। এই ধারাটি ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করেছিল ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী সরকার। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের কণ্ঠরোধের জন্য এই ধারার সংযুক্তি ঘটেছিল। রাষ্ট্রদ্রোহিতা কি? ওই ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কিংবা সার্বভৌম শাসক বা সম্রাটের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করা রাষ্ট্রদ্রোহ হিসাবে বিবেচিত হবে। এই দানবীয় ধারাটির অপব্যবহার করা হয়েছে আকছার। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে এ ধারার অপপ্রয়োগ করেছে ব্রিটিশ সরকার। বাল গঙ্গাধর তিলক, গান্ধিজী এবং বহু দেশপ্রেমিকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে তাঁদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অনেককে দীর্ঘমেয়াদি কারাবাসের দণ্ড দেওয়া হয়েছে। যে কারণে গান্ধিজী রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধারাটিকে "নাগরিকদের স্বাধীনতা দমন করার লক্ষ্যে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির রাজনৈতিক অনুচ্ছেদগুলির শিরোমণি" বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় রাষ্ট্র কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহের ধারাটির সামান্য সংশোধন করে ফৌজদারি দণ্ডবিধির অংশ হিসাবেই একে রেখে দিল। কী সংশোধিত হলো? "মহামান্য সরকার" — এর জায়গায় এলো ভারত সরকার। তখনকার প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ১৯৫১ সালে সংসদের এক বিতর্কে বলেছিলেন—" আমার মতে এই ধারাটি (রাষ্ট্রদ্রোহ সংক্রান্ত) প্রচণ্ড আপত্তিকর ও নিন্দনীয় এবং আমরা যে আইন প্রণয়ন করব তার গায়ের কোনও জায়গাতেই তার স্থান হতে পারে না।"

কিন্তু এই ধারা রয়েই গেল। একটি উপনিবেশবাদী কুখ্যাত আইন যেমনটি আগে ছিল তেমনটিই রয়ে গেল। এটা ভীষণ লজ্জার! এই ধারাই প্রযুক্ত হয়ে চলেছে স্বাধীন ভারতের হাজার হাজার মানুষের বিরুদ্ধে। দশকের পর দশক ধরে অব্যাহত রয়েছে এই নির্মমতা। কংগ্রেস কিংবা একের পর এক আসা কেন্দ্রের সরকারগুলির কেউ-ই এই জঘন্য ধারাটিকে ফৌজদারি দণ্ডবিধি থেকে ছেঁটে ফেলার উদ্যোগ নেয়নি।

১২৪ (ক) ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইভাবে —" আইনবলে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে মৌখিক অথবা লিখিতভাবে, স্বাক্ষর করে বা দৃশ্যমান উপায়ে কিংবা অন্য কোনওভাবে ঘৃণা বা অবজ্ঞা ছড়ানো বা ছড়ানোর চেষ্টায় জনগণকে ক্ষুব্ধ ও প্ররোচিত করা বা করার চেষ্টা চালানো"।

লক্ষ্য করুন কার বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরির কথা এই ধারায় বলা হয়েছে? 'রাষ্ট্র'-র

বিরুদ্ধে নয়, 'সরকার'-র বিরুদ্ধে! তার অর্থ কী দাঁড়াচ্ছে? নির্বাচিত কোনও সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা বা প্রতিবাদকে 'রাষ্ট্রদ্রোহ' বলে আখ্যায়িত করা যাবে। কী ভয়ঙ্কর কথা! এটা কি দানবীয় ধারা নয়? শুধু তাই নয়, ধারাটি সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক এবং ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক ভিত্তি গণতন্ত্র ও বাক্ স্বাধীনতার পরিপন্থী।

বহু ক্ষেত্রে এই ধারার অপপ্রয়োগ হয়েছে। তার অনেক জ্বলন্ত উদাহরণ রয়েছে। পাঁচ বছর আগে ডাক্তার বিনায়ক সেনকে, যিনি ছত্তিশগড়ের গরিব মানুষদের চিকিৎসার কাজে আত্মনিয়োজিত ছিলেন, তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে জেলা আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। শেষে অবশ্য শীর্ষ আদালত থেকে তিনি জামিনে মুক্ত হন। সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে বলেছিল ডা. বিনায়ক সেনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। ১৯৬২ সালেই সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে এই ধারা প্রয়োগের জন্য হিংসার প্ররোচনা দেওয়ার সুনির্দিষ্ট প্রামাণ্য তথ্য থাকতে হবে।

কিন্তু, পুলিশ ও নানা ধরনের সরকার সেই সব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এখনও রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা রুজু করছে, যারা সরকারের বা সরকারি ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের রাজনৈতিক বিরোধিতা অথবা তাদের প্রকাশ্য সমালোচনা করছেন।

সম্প্রতি, কার্টুনিস্ট,ছাত্র, রাজনৈতিক ও সমাজ কর্মীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ এনে তাদের জেলে ঢোকানো হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন মুম্বাই-র কার্টুনিস্ট অসীম ত্রিবেদী। তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্টুন এঁকে প্রচার করেছিলেন। রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তামিলনাড়ুতে কয়েক হাজার মানুষকে এই দানবীয় ধারায় অভিযুক্ত করা হয়। তাদের অপরাধ? তারা কুদামকুলান পরমাণু কেন্দ্র স্থাপনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন। মীরাটে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া কাশ্মীরের ৬৭ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে ২০১৪ সালে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল, তারা না কি ভারত- পাক ক্রিকেট ম্যাচে পাকিস্তানের জয়ের পর উল্লাস করেছিলেন। ওই বছরই ত্রিবান্দ্রমে ছয় যুবককে এই ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগ কী? সিনেমা হলে জাতীয় সংগীত বাজানোর সময় তারা নাকি দাঁড়াতে অস্বীকার করেছিল।

মোদি সরকারের আবির্ভাবের পর তো এই বাতাস আরও গতি পেয়েছে। সরকার কিংবা মোদির বিরোধিতা করলেই "জাতীয়তা বিরোধী" এবং সেইহেতু অহরহ রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হচ্ছে। সাম্প্রতিককালের জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জে এন ইউ) ঘটনা। জে এন ইউ ছাত্র সংসদের সভাপতি কানহাইয়া

কুমার ও আরও কয়েকজন ছাত্রের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা করা হয়েছে এবং তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এমনকি যারা জে এন ইউ'র প্রতিবাদী ছাত্রনেতাদের সমর্থনে কথা বলেছেন এবং তাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধেও রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে আছেন সীতারাম ইয়েচুরি ও অন্যান্য বিরোধী দলের কয়েকজন নেতা।

ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে যতদিন রাষ্ট্রদ্রোহ সংক্রান্ত এই ধারাটি বহাল থাকবে ততদিন পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থার নিচুতলায় বিরোধীদের কণ্ঠ স্তব্ধ করার জন্য এই ধারার অপপ্রয়োগের সুযোগ থাকবে। এই ধারার মৌলিক চরিত্রই হচ্ছে দানবীয়। সে কারণেই সি পি আই (এম) ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারাটি বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মোকাবিলায় আইনে আরও অনেক ধারা রয়েছে। সুতরাং এই অজুহাতে ১২৪ (ক) ধারার বহাল থাকা যুক্তিযুক্ত নয়।

প্রশ্ন : মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে সি পি আই (এম)'র অবস্থান কি?

এম আই এম নেতা মন্তব্য করেছেন ইয়াকুব মেমনকে ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হলো তার ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য— এ সম্পর্কে পার্টির বক্তব্য জানতে চাই।

উত্তর: দেখুন, সি পি আই (এম) মৃত্যুদণ্ডের অবসান চায়। কারণ, একবার কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিলে প্রয়োজনে সেই জীবন ফিরিয়ে আনা যায় না। এ দণ্ড একবার কার্যকর হয়ে গেলে তার আর পরিবর্তনের সুযোগ থাকে না। বিচার ব্যবস্থায়, আদালতের রায়ে ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে। মৃত্যুদণ্ডাদেশের ক্ষেত্রেও ভুলত্রুটি হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, অন্যায্য বিচারপর্বের খাঁড়া সমাজের গরিব ও ক্ষমতাহীনদের উপরই নেমে আসে। ভারতের বিচার ব্যবস্থার পাল্লা সমাজের গরিব ও অবদমিতদের বিপক্ষেই ঝুলে থাকে। তৃতীয়ত, সমাজে ভয়- ভীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে খুন বা গুরুতর অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু ফাঁসি কাঠে ঝুলতে দেখে সমাজে খুন বা গুরুতর অপরাধ কমেছে এমনটি কোথাও দেখা যায় না।

১৯৮৩ সালে এক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে— কেবলমাত্র বিরলতম ঘটনাতেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত। এই রায়ের পরবর্তী সময়ের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার ঘটনাগুলির সমীক্ষায় বিচারক ও বিচার ব্যবস্থার মারাত্মক স্বেচ্ছাচারিতা ও অহমবোধ প্রতিফলিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালের মৃত্যুদণ্ডের ঘটনাগুলি বিশেষভাবে উদ্বেগের বিষয়। এসব ঘটনায় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা বা না করার বিষয়টি বিবেচিত হয়েছে। আফজল গুরু

ও ইয়াকুব মেমনের ফাঁসি হয়ে যায়। অথচ রাজীব গান্ধী ও বিয়ন্ত সিং হত্যার ঘটনার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড মকুব করা হয়। এরকম একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে রাজনৈতিক বিবেচনার দিকটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

গুরুতর অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বদলে আজীবন কারাবাসের পক্ষে আমরা। তাতে বিচারপর্ব শেষ অবধি চলার সুযোগ থাকবে।

এম আই এম নেতা ওয়াইসি সাহের ইয়াকুম মেমনের ফাঁসি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। যদিও এটা সত্যি যে ২০০৪ সালের পর যে দুজন ভারতীয়র ফাঁসি হয়েছে তারা দুজনই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা যে সামগ্রিকভাবে সামাজিক পক্ষপাতদুষ্টতা থেকে মুক্ত নয় এটা তারই উদাহরণ। এটা মনে রাখা দরকার যে, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর শত শত মুসলিমের নিধন যজ্ঞের প্রতিক্রিয়ায় ১৯৯৩ সালে মুম্বাই বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। ওই সব হত্যার ঘটনার একজন অভিযুক্তেরও শাস্তি হয়নি। বিচারপতি শ্রীকৃষ্ণ কমিশনের সুপারিশ আজও কার্যকরী হয়নি।

অবশ্য ওয়াই সি সাহেব ও এম আই এসব ইস্যুকে ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িক জিগির তোলা ও রাজনৈতিকভাবে তাকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট। অন্যদিকে সি পি আই (এম)'র কাছে প্রশ্নটি বিচারের। পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবস্থায় গরিব, অবদমিত ও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিচার কিভাবে বৈষম্যমূলক হয়, আমাদের কাছে সেটাই মূল প্রশ্ন। এসব নানা দিক বিবেচনা করে সি পি আই (এম) মৃত্যুদণ্ডের অবসান চায়।

প্রশ্ন : সি পি আই (এম)'র কর্মসূচির সংশোধিত ধারা, ৭.১৭ নং প্যারায় কেন্দ্রীয় সরকারেও যোগদানের কথা বলা হয়েছে। এটা কি কমরেড জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের যোগদান না করার ভুলের স্বীকারোক্তি?

একজন নেতৃস্থানীয় কমরেডের লেখা থেকে যা বুঝতে পেরেছি যে আগের কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট বিষয়ক ধারায় 'রাজ্য' শব্দটিই কেন্দ্রীয় সরকারের যোগদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির সামনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল? আমার ধারণা সঠিক কিনা বলবেন কি?

উত্তর : সময়োপযোগী পার্টি কর্মসূচীর ৭.১৭ নং প্যারায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদানের প্রশ্নে পার্টির অবস্থান বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটা সত্যি যে ১৯৬৪ সালে গৃহীত পার্টি কর্মসূচীতে পার্টি ও বাম নেতৃত্বাধীন জোট জনসমর্থনে জয়ী হলে রাজ্য সরকারে যোগদানের কথা বলা হয়েছিল। এটা আসলে রণকৌশলগত বিষয়। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদানের প্রশ্নটি রণরীতিগত বা কর্মসূচির বিষয় নয়। সি পি আই (এম) গঠিত হওয়ার পর ১৯৬৫ সালে কেরালা বিধানসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে

ধারণা করে এই নির্বাচনে প্রথম সি পি আই (এম) অংশ নিচ্ছে এবং সরকার গঠনের সম্ভাবনাও রয়েছে বিবেচনায় কর্মসূচির ১১২নং ধারাটি যুক্ত করা হয় এবং রাজ্য সরকারে যোগদানের প্রশ্নে পার্টির রণকৌশলগত অবস্থান বিবৃত করা হয়।

সাধারণ নির্বাচনের পর ১৯৯৬ সালেই প্রথম কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদানের প্রশ্নটি পার্টির সামনে আসে। জ্যোতিবসুকে প্রধানমন্ত্রী করার প্রস্তাবে আসে। কেন্দ্রীয় কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তের পেছনে পার্টি একই যুক্তি দেখায়। কারণ রাজ্য বা কেন্দ্রে সরকারে যোগদানের ভিত্তি একই। যেখানে আমাদের এমন শক্তি থাকবে না যাতে আমরা সরকারের নীতি নির্ধারণ ও রূপায়ণে প্রভাব খাটাতে পারি, সে সব রাজ্যে আমরা সরকারে যাব না। আরও একটি কারণ ছিল। বুর্জোয়া দলগুলির প্রাধান্য এই সরকারে থাকবে। এ অবস্থায় আমাদের পার্টি এ ধরনের সরকারে যোগদান করবে না। একথাগুলি তখন বলা হয়েছিল। পার্টির এই অবস্থান ১৬তম পার্টি কংগ্রেসে পর্যালোচিত ও অনুমোদিত হয়।

কেন্দ্রীয় কমিটি এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদানের কথা পার্টি কর্মসূচিতে নেই এই যুক্তির অবতারণা করেনি। রাজ্য কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদানের ভিত্তিও ঐ একটাই। আমাদের শক্তি কতটা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকে কেন্দ্রের হাতে, রাজ্যের হাতে নয়।

সুতরাং ২০০০ সালে গৃহীত সময়োপযোগী পার্টি কর্মসূচীতে কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করাটা ১৯৯৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারে অংশ না নেওয়ার ভুলের স্বীকারোক্তি— এভাবে ভাবাটা ভুল। সরকারে যাওয়া, না যাওয়াটা রণকৌশলগত বিষয়। সময়, সুযোগও সামগ্রিক পরিস্থিতির নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ করেই এ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একথাটা বোঝাবার জন্যই ৭.১৭ প্যারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সংসদের ভেতরে ও বাইরে পার্টি ও বামপন্থীদের শক্তি যেমন বিবেচনায় আনতে হবে তেমনি বিবেচনা করতে হবে সংসদের ভেতরে ও বাইরে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি অবস্থা কতটা শক্তিশালী। বিকল্প নীতিমালা উত্থাপন ও রূপায়ণের জন্য গণসংগ্রামের ক্ষমতাও অতি অবশ্যই বিবেচ্য বিষয় হবে।

প্রশ্ন : আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ জেলে রয়েছে। তাদের কোনও ভোটাধিকার নেই। রয়েছে সেনা বাহিনীর সদস্য ও আরক্ষা কর্মীরা। তাদের ভোটাধিকার থাকলেও ভোটাধিকার প্রয়োগের কোনও সুযোগ নেই। অথচ, কেন্দ্রীয় সরকার প্রবাসী ভারতীয়দের (এন আর আই) জন্য ভোট দেওয়ার অধিকার দিতে বিশেষ মনোযোগী

হয়ে উঠেছে। বলা হচ্ছে তাদের পক্ষে অন্য কেউও প্রক্সি ভোট দিতে পারবে। এটা কি আইন বিরুদ্ধ নয়? আমাদের পার্টি বিষয়টিকে কী ভাবে দেখছে?

উত্তর : দেশের শীর্ষ আদালত এক রায়ে বলেছে, বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের ই-ভোট দেওয়ার অধিকার থাকতে হবে। নির্বাচন কমিশনও তাদের জন্য প্রক্সি ভোটের ব্যবস্থা করার চিন্তা-ভাবনা করছে।

সি পি আই (এম) ই- ভোটের পক্ষে নয়। ই- ভোটিং মানে ই- মেলে ভোট দেওয়া। পার্টি মনে করে এ পদ্ধতিতে ভোটের অপব্যবহার ও কারচুপি হতে পারে। আর প্রক্সি ভোট তো ই-ভোটের চেয়েও জঘন্য। এতে ভোট কেনার অবাধ সুযোগ তৈরি হবে। এসব পদ্ধতি নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করবে।

প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য প্রত্যক্ষ ভোটের ব্যবস্থা করার কথাটা ত্রুটিপূর্ণ। কারণ দেশের ভেতরেই লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন যাদের পক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। কারণ , তারা কাজের জায়গায় থাকেন, থাকেন বাড়ি থেকে অনেক দূরে। কাজের জায়গায় তাদের নাম ভোটার তালিকায় স্থান পায় না। এখন পর্যন্ত শুধু দূরবর্তী সীমান্তে কর্মরত জওয়ানদের প্রক্সি ভোটের অধিকার রয়েছে।

জেলে লক্ষ লক্ষ বিচারাধীন বন্দির বর্তমানে ভোটের অধিকার নেই। এটা অন্যায়। যারা জেলে ছিলেন, জামিন পেয়ে বাড়ি এসেছেন তারা ভোট দিতে পারেন। জামিন না পাওয়া লোকেদের অনেকেই গরিব অংশের। বিচারাধীন হয়ে তাদের জেল হাজতে থাকতে হয়। বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের মধ্যে পার্থক্য টানা দরকার। বিচারাধীন বন্দিদের জন্য ভোটাধিকারের সুযোগ দিয়ে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের সংশোধন করা হোক।

প্রশ্ন : নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে সি পি আই (এম) কিছু বলছে না কেন?

উত্তর : সি পি আই (এম) যে কোনও স্তরের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা কিংবা অন্য কোনও পূর্বশর্ত আরোপের সম্পূর্ণ বিরোধী। একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে সব নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে। ধনী কিংবা নির্ধন, সম্পদশালী কিংবা সম্পদহীন, শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত সকলেরই সমান অধিকার রয়েছে। সাধারণতন্ত্রী সংবিধানের এটাই হচ্ছে ভিত্তি। এর দ্বারা সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সব নাগরিকের সমান রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত। ভারতীয় সংবিধানে সব নাগরিকের এই মৌল অধিকার দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা বা অন্য কোনও শর্ত চাপিয়ে নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার নিয়ন্ত্রিত করা গণতন্ত্র বিরোধী ও সংবিধান বিরোধী। সম্প্রতি হরিয়াণায় এমনটি

করা হয়েছে। ওখানকার বিজেপি সরকার আইন পাস করালো এই মর্মে যে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী হতে গেলে অসংরক্ষিত ক্ষেত্রে পুরুষ প্রার্থীদের অন্তত মাধ্যমিক পাসের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। মহিলা ও তপশিলী সংরক্ষিত আসনে দাঁড়াতে গেলে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে ৮ম শ্রেণি উত্তীর্ণ (মিডল স্কুল পাস)। এই শর্তারোপের ফলে আদমসুমারির তথ্য অনুযায়ী ৮৩ শতাংশ তপশিলী মহিলা, ৭২ শতাংশ সাধারণ মহিলা, ৭১ শতাংশ তপশিলী পুরুষ এবং ৫৬ শতাংশ সাধারণ পুরুষ পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা হারাবেন।

এটা গরিব, মহিলা, দলিত ও অন্যান্য নিপীড়িত অংশের অধিকাংশ নাগরিকের মৌল অধিকার ও নাগরিকত্বের উপর আক্রমণ ছাড়া কিছু নয়। সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি এর বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে গিয়ে এই আইন কার্যকরী করার উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ আদায় করেছে।

ঠিক এভাবেই রাজস্থানের বিজেপি সরকারও পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত আরোপ করেছে। এটাকে দেশে ক্রমবর্ধমান স্বৈরাচারী প্রবণতা হিসাবেই দেখতে হবে। গণতন্ত্রের উপর এ ধরনের আক্রমণ প্রতিহত করতে এবং নাগরিকদের মৌল অধিকার সুরক্ষিত রাখতে গণসংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।

প্রশ্ন: জিন- পরিবর্তিত ফসল (জি এম) সম্পর্কে সি পি আই (এম) -র অবস্থান কি? জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে অসুবিধা কোথায়?

উত্তর: সি পি আই (এম) এমন সব বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনকে কাজে লাগানোর পক্ষে, যা কি না জনগণ ও কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষিত করে। পার্টির দৃঢ় অভিমত হচ্ছে, এ ধরনের জিন- পরিবর্তিত ফসল মানুষ, জীবজন্তু ও পরিবেশবান্ধব কি না তা সুনিশ্চিত হওয়ার আগে এই ফসল বাণিজ্যিকভাবে বাজারে ছাড়া যাবে না। এর জন্য সুদক্ষ নিয়ামক বিশেষজ্ঞদের দিয়ে জৈব নিরাপত্তা সম্পর্কে দীর্ঘ সময় ধরে কঠোর পরীক্ষা -নিরীক্ষা চালাতে হবে। তাদেরকেই নিশ্চিত করতে হবে যে এধরনের ফসল মানুষ, জীবজন্তু, পরিবেশ ও দেশের জৈব বৈচিত্র্যের পক্ষে নিরাপদ কি না। স্বচ্ছভাবে পরীক্ষালব্ধ যাবতীয় তথ্য জনগণের সামনে এনে জনগণের আস্থা অর্জন করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভূমিকা নিতে হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, জৈব নিরাপত্তা ও জৈববৈচিত্র্য সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে কোনও ধরনের আপস চলবে না। এ ধরনের ফসল বাজারজাত করার আগে রাষ্ট্রের প্রভাবাধীন কোনও স্বাধীন সংস্থার মাধ্যমে কঠোর পরীক্ষা- নিরীক্ষার ফলাফল ও মূল্যায়ন জনসমক্ষে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

একচেটিয়া বীজ - ব্যবসাদার ও কৃষিপণ্য ব্যাপারীদের লক্ষ্য হচ্ছে কী করে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা যায়। জৈব নিরাপত্তা, জৈব বৈচিত্র্য, পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি নিয়ে তারা

মাথা ঘামায় না। কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে ভারত- মার্কিন চুক্তি হয়েছে। যার নাম যৌথ নলেজ ইনিসিয়েটিভ। যৌথ গবেষণার উদ্যোগ। এই উদ্যোগে যুক্ত থাকবে কৃষিপণ্য বিপণনকারী একচেটিয়া কারবারিরা। যেমন, মনসান্টে, ওয়াল মার্ট, আর্চার ড্যানিয়েলস্ মিডল্যাণ্ড , কারগিল ও আই টি সি -র মতো রাঘববোয়ালরা। এরা ভারত- মার্কিন যৌথ কৃষি গবেষণা উদ্যোগের পরিচালন কমিটিতে থাকবে। তাদের পরামর্শে কৃষি গবেষণা ও নীতির অভিমুখ এমন হবে যাতে তাদের সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত হয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মনসান্টো এক ধরনের টন টন কমলা উৎপাদন করেছে ও বিক্রি করে অতি মুনাফা কামিয়েছে। ভিয়েতনামবাসীদের ভবিষ্যৎ কী হবে এ নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা ছিল না। এসব বহুজাতিক কোম্পানির সেই চরিত্র একটুকুও পালটায়নি। সুতরাং, আমাদের দৃঢ় অভিমত হচ্ছে পরীক্ষা- নিরীক্ষার কাজটি করতে হবে একমাত্র আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দিয়ে। কোনও বহুজাতিক সংস্থা, কিংবা কৃষি বিপণনকারী একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের তাতে কোনও মতেই অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। পরীক্ষামূলক চাষাবাদেও তাদেরকে অনুমতি দেওয়া চলবে না। সচেতনভাবেই রাষ্ট্রায়ত্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বশাসন সুরক্ষিত রাখতে হবে।

ভারতীয় কৃষি ক্রমবর্ধমান গতিতে বিশ্বের একচেটিয়া বীজ ও কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীদের থাবার নিচে চলে যাচ্ছে। এরা ভারতীয় কৃষকদের কাছ থেকে চড়া দাম আদায় করছে। বীজ- ব্যবসায়ীরা প্রতি বছর বিশাল পরিমাণ রয়্যালিটি আদায় করে নিচ্ছে। শুধু বীজ নয়, মনসান্টো-র মতো একচেটিয়া কোম্পানির হাতে চলে যাচ্ছে কৃষি প্রযুক্তি। এরাই এখন প্রযুক্তির একচেটিয়া মালিক। এ এক গভীর উদ্বেগের বিষয়। বীজ, সার, ওষুধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির দাম কমানোর যে কোনও উদ্যোগকে এরা বাধা দিচ্ছে। আমাদের কৃষকদের নিজস্ব বীজ বলে তো আজ আর কিছু নেই। কারণ, এগুলো এখন ' বৌদ্ধিক সম্পদ'-র আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। আমাদের কৃষকদের তাই রাঘববোয়ালদের উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে। বীজ উৎপাদনে দেশের স্বনির্ভরতা অর্জনে সরকারের কোনও উদ্যোগ নেই। কৃষকদের অভিজ্ঞতা ও কৃষিবিজ্ঞানীদের কোন পরামর্শও সরকার গ্রহণ করতে আগ্রহী নয় বরং সরকার ভারতীয় কৃষিকে বড় বড় কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীদের হাতে বিক্রি করে দিয়েছে। ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রসহ নানা গবেষণা সংস্থাগুলিকে বহুজাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত করে দেশকে আমেরিকার ছোট শরিকে পরিণত করেছে।

বিটি বেগুন নিয়ে কথা উঠেছিল। এক্ষেত্রেও জৈববৈচিত্র্য রক্ষার প্রশ্নটি সামনে এসেছিল। এ নিয়ে একটি স্বাস্থ্যকর বিতর্ক গোটা দেশকে তোলপাড় করেছিল। জৈববৈচিত্র্য সুরক্ষার প্রশ্নটি এই প্রথম গুরুতরভাবে সামনে আসে। কোনও পরীক্ষা- নিরীক্ষা ছাড়াই

জিন পরিবর্তিত বেগুন বাণিজ্যিকভাবে বাজারে ছাড়ার অনুমতি দিতে সরকার তৎপরতা চালাচ্ছিল। এই বিতর্ক সরকারকে পিছু হটতে বাধ্য করে এবং বিটি বেগুন বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। এমনিভাবে সরিষার জি এম বীজও বাজারে ছাড়ার চেষ্টা হয়। একচেটিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে একটি আবেদনও জমা পড়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকে। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রক একটি নিয়ন্ত্রণে কমিটি গঠন করে (জি ই এ সি)। দুটো ক্ষেত্রেই সি পি আই (এম) এসব বীজ দিয়ে বাণিজ্যিক উৎপাদনের বিরোধিতা করে। কেন সি পি আই (এম) এই অবস্থান গ্রহণ করেছে?

ভারত সরকার দেশের কৃষকদের স্বার্থ ও জৈব নিরাপত্তা বিচারে না এনে বীজের বাজার বিশ্বের একচেটিয়া পুঁজির হাতে তুলে দিয়ে এবং জি এম বীজ পরীক্ষার জন্য যথাযথ নিয়ন্ত্রক কোনও ব্যবস্থা না করে কেবল বহুজাতিক সংস্থাগুলির জন্য সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের কাজটাই নিশ্চিত করতে চায়। এই বীজ ব্যবহার করে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে কেন বীজ কোম্পানি তাদের ক্ষতিপূরণ দেবে না? এরকম হলে এসব কোম্পানিকে কেন কালো তালিকাভুক্ত করা হবে না? এই মর্মে কোনও কঠোর আইন কি ভারত সরকার করেছে? জি টি বেগুন সম্পর্কে বীজ কোম্পানিগুলি যেসব তথ্য দিয়েছে, তার উপরই আমরা ভরসা করব কেন? কেন আমাদের দেশের কোনও দক্ষ রাষ্ট্রায়ত্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবো না? এটাই তো ছিল আমাদের প্রশ্ন। এনিয়েই দেশজুড়ে একটা জনমত তৈরি হয়েছিল। তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের তৈরি করা জি ই এ সি নামের নিয়ামক সংস্থার কোনও কোনও ব্যক্তির সঙ্গে মনসান্টোর মতো বীজ কোম্পানিগুলির ঘনিষ্ঠতা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। সব কিছু খুঁটিনাটি দেখে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন এমন দক্ষতাসম্পন্ন কৃষি গবেষকদের দিয়ে বি টি বেগুন ও জি এম সরষের বীজ পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এটা না করে ভারতে এর ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া চলবে না।

আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও গবেষণালব্ধ আবিষ্কার, যা আমাদের কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে সাহায্য করবে, তাকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি দেখতে হবে পরিবেশ, জীবজন্তু ও মানুষের ওপর তার কী ধরনের প্রভাব পড়ে। এসব বীজের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল জনসমক্ষে আনতে হবে। জিন - পরিবর্তিত ফসলের কারণে প্রকৃতিতে তার সম্ভাব্য ক্ষতি যেহেতু সারাই করা যাবে না সেই কারণেই এ সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সরকারকে সব দিক বিচার- বিবেচনা করতে হবে।

প্রশ্ন : জলশক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিপরীতে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রশ্নে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে বলবেন কি?

উত্তর : জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে বহমান নদী থেকে কিংবা বিশাল পরিমাণ জল আটকানোর জন্য বাঁধ তৈরি করে। বহমান জলধারা প্রকল্পগুলি পরিবেশের উপর খুব কমই প্রভাব ফেলে। যদিও একই নদীতে এ ধরনের বহু প্রকল্প রূপায়িত হলে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পড়তে পারে। বহমান ধারায় নির্মিত প্রকল্পগুলি পরিবেশবান্ধব বলেই বিবেচিত হয়। বড় বড় বাঁধ, যেখানে প্রচুর পরিমাণে জল ধরে রাখার জন্য জলাধার নির্মিত হয়, সেখানে বহু এলাকা জলে ডুবে যায় এবং অনেক লোকের উৎখাত হতে হয়। সে কারণে প্রথমটির চেয়ে এই ধরনের বাঁধ তৈরি করে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করলে পরিবেশের উপর যথেষ্ট প্রভাব পড়ে।

জলশক্তি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খুঁটিনাটি বিষয়ে যাওয়ার আগে কিছু বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের উপর আমাদের নজর দেওয়া দরকার। বিশ্বের বাঁধের তালিকায় বড় বড় বাঁধের সংখ্যা হচ্ছে ৫৮,৪০২টি। এর মধ্যে ভারতেই রয়েছে ৫ হাজারটি। বাঁধ দিয়ে বহুমুখী প্রকল্প তৈরি করা হয়। যেমন, জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলশক্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন অথবা কোনও কোনওটি শুধু একটি উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়। বিশ্বের মোট বাঁধের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই হচ্ছে একটি উদ্দেশ্যেই নির্মিত। তামিলনাড়ু গ্র্যান্ড আনিকাট প্রকল্পটি খ্রিস্ট পরবর্তী দ্বিতীয় শতাব্দীতে চোল রাজাদের দ্বারা তৈরি হয়েছিল। পরে ব্রিটিশরা উনিশ শতকে এর ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম বাঁধগুলির অন্যতম। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং- এ ভারতের গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। প্রাচীনকালেও এ দেশে বড় বড় বাঁধ নির্মিত হয়েছে।

পুরাকালে এসব বড় বড় বাঁধ যে নির্মিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল না, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসেচের ব্যবস্থা করাও এর লক্ষ্য ছিল। ভারতে বর্ষাকালে প্রচুর জল পাওয়া যায়। এটা মরশুমি। এই জলকে আটকে না রাখতে পারলে শুকনো মরশুমে এই জল আমরা ব্যবহার করতে পারি না। নিশ্চিত জলসেচের মাধ্যমে একাধিক ফসল করার প্রশ্নটি আজকাল বেশ গুরুত্ব পাচ্ছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। দামোদরের ক্ষেত্রে এর সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। চীনের দুঃখ বলে পরিচিত ছিল হোয়াংহো নদী। প্রতি বছরই বন্যা হতো। তেমনি দামোদর নদও প্রতি বছর বিপর্যয় ডেকে আনতো। কিন্তু এখন ঐ নদীগুলোতে বাঁধ দিয়ে বহুমুখী প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে এই প্রকল্পের উপজাত।

অবশ্য, কোনও প্রকল্পে জলশক্তির ব্যবহার বাঁধের উচ্চতা বাড়ানোর প্রয়োজন সৃষ্টি করে। তার ফলে আরও বেশি এলাকা জলের নিচে চলে যায়। নর্মদা বাঁধের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বাঁধের উচ্চতা কতটুকু হবে, উচ্চতা কতটুকু হলে পড়ে জলসেচের সুযোগ আরও বাড়ানো যাবে— এ প্রশ্নটি প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কত কম এলাকা

জলমগ্ন হবে, কত কম জনসংখ্যা উৎখাত হবে ইত্যাদি প্রশ্ন। বাঁধের উচ্চতা কমানোর বিরোধিতা করে নর্মদা কর্তৃপক্ষ বলেছে— এতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাবে এবং সম্ভাব্য উপলব্ধ সুযোগের সবটাকে কাজে লাগানো যাবে না।

পরিবেশের ক্ষতির বিষয়টির চেয়ে এখানে বড় প্রশ্ন হচ্ছে— বিরাট সংখ্যক মানুষ জলাধার থেকে উৎখাত হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এককাট্টা হয়ে প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন। জনগণের উৎখাত হওয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সরকারি ব্যর্থতা। কত মানুষ জমিহারা হলো, রুটি- রুজি বন্ধ হলো কতজনের! এরা কিছুই পেলো না। তো, মানুষ প্রতিবাদী হবে না কেন? আর একটি বিষয় হচ্ছে প্রায়ই নদীর জলবণ্টন নিয়ে আন্তঃরাজ্য বিরোধ দেখা দেয়। কেন্দ্রে ও রাজ্যে একের পর এক সরকার এসেছে। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হয়নি। মানুষ এখন সরকারি আশ্বাসের উপর আস্থা রাখতে পারছে না। তাই জনগণের মধ্যে এখন বড় বড় বাঁধ নির্মাণের বিরোধিতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বড় বড় বাঁধের বিপদও রয়েছে। যদি বাঁধ ভাঙে তবে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। নিরাপদ বাঁধ নির্মাণ করা যায় না— এটা আমরা বিশ্বাস করি না। শত শত বছর ধরে নিরাপদ বাঁধ তৈরি হচ্ছে। এমনকি ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায়ও ভূকম্প নিরোধক যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে বাঁধ তৈরি করা সম্ভব। এটা ঠিক যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথ করার জন্য নির্মাণ খরচ বাড়তে পারে। প্রকল্প তৈরির সময় অনুমিত খরচ স্থির করার সময়ই নিরাপত্তার কথাটি বিবেচনায় আনতে হবে। এখন যে বাঁধগুলি রয়েছে, সেগুলিরও নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সমীক্ষা করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

আমরা মনে করি না যে, সব বাঁধের উচ্চতা একই রকমের হতে হবে। কোথাও কোনও বাঁধই নির্মাণ করা যাবে না— এ ধরনের দাবিকে আমরা সমর্থন করি না। প্রতিটি নদীর জলের প্রবাহ ও পরিমাণে ভিন্নতা রয়েছে। প্রত্যেকটিরই আলাদা ধরনের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। সে কারণে যে কোনও বাঁধ নির্মাণে পরিবেশের ওপর তার প্রভাব ও ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে। বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব কী হবে। সামগ্রিক লাভ-ক্ষতি বিচার করেই নির্মাণ কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। আমাদের আরও আধুনিক পদ্ধতিতে বিচার করে দেখা দরকার যে, আগের মতোই আমরা বড় বড় প্রকল্প নির্মাণ করবো কী না। বৃহৎ ও জটিল প্রকল্প নির্মাণের কাজ, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পূর্ত দপ্তরের কালভার্ট নির্মাণের কাজের মতো নয়। বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন পরিবেশের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে তার মূল্যায়ন আগেই করতে হবে এবং প্রকল্পের সম্ভাব্য খরচ ও প্রকল্প চালু

হওয়ার পর কত সময়ে কী ধরনের আর্থিক সুবিধা মিলতে পারে তারও মূল্যায়ন করতে হবে। বাঁধের উচ্চতা, জলাধারের আয়তন, কত পরিবার উচ্ছেদ হবে, কত পরিমাণ জমি নিশ্চিত সেচের আওতায় আসবে, কী পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির আর্থিক পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ইত্যাদি সব কিছুকেই প্রকল্পের অনুমিত ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে জলশক্তি ছাড়াও অন্য শক্তি ব্যবহার করা যায়। সেচের ক্ষেত্রে হয় উপরিতলের জল (নদী, পুকুর, খাল, নালা ইত্যাদি) ব্যবহার করতে হবে, নতুবা মাটির নিচের জল তুলতে হবে। জলসেচের কাজে উপরিতলের জল যুগের পর যুগ ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মাটির নিচের জল ব্যবহারের ফলে দেশের অনেক অংশের ভূগর্ভ শূন্য হয়ে যাচ্ছে, যা জল দিয়ে দ্রুত পূরণ করা যায় না। সে কারণে উপরিতলের জলের ব্যবহার করেই আমাদের সেচের চাহিদা পূরণ করতে হবে। সেটা করতে গিয়ে বাঁধও নির্মাণ করা যেতে পারে। বাঁধ নির্মাণের বহুবিধ উদ্দেশ্য থাকলেও আপত্তির কিছু নেই।

সবশেষে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে শক্তিই আমরা ব্যবহার করি না কেন, সবক্ষেত্রেই পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। জীবাশ্ম থেকে পাওয়া কয়লা ও তেল ব্যবহারে দূষিত গ্যাস নির্গত হয় এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে আরও বেশি ক্ষতিকারক বর্জ্য পদার্থ নির্গত হয়। এই তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থের নিরাপদ রূপান্তর আজও এক বড় সমস্যা হয়ে রয়েছে। ফুকুশিমার ঘটনা আমাদের স্মরণে আছে। দুর্ঘটনাজনিত অতিরিক্ত বিপদ সেখানে প্রত্যক্ষ করা গেছে। সৌর ও বায়ুশক্তির ব্যবহারও পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তবে সৌর ও বায়ুশক্তি পুনর্নবীকরণযোগ্য। সে জন্য জীবাশ্ম জ্বালানি ও পরমাণু শক্তি ব্যবহারে পরিবেশ যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সৌরশক্তি ও বায়ুশক্তি ব্যবহারে ততটা হয় না। আমরা যেমন সুবিধাটা বিচার করব, তেমনি সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কেও বিচার করতে হবে। এসব বিচার করেই আমাদের বিরোধিতার যুক্তিগ্রাহ্যতা ঠিক করতে হবে। সবক্ষেত্রেই বিরোধিতা করা সঠিক হবে না।

প্রশ্ন: আমাদের দল সি পি আই (এম) কেন পারমাণবিক শক্তি ও পরমাণু প্রযুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছে না? আমরা জানি হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফেলার পর প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন প্রচণ্ডভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। কিছু অতি বামপন্থী দল পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণার সম্পূর্ণ বিরোধী। কিছু দেশও

জননিরাপত্তার কথা ভেবে পরমাণু শক্তির গবেষণা বন্ধ রেখেছে। তবে সি পি আই (এম) কেন পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণা ও পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের পক্ষপাতি? কেন আমরা পরমাণু গবেষণার প্রতি সমর্থন জানাছি?

উত্তর: সি পি আই (এম) বরাবরই পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণা এবং বিদ্যুৎ ও অস্ত্র উৎপাদনে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য রেখা টেনে এসেছে। আমরা পরমাণু অস্ত্র তৈরির বিরোধিতা করি এবং আণবিক অস্ত্রমুক্ত পৃথিবী গড়ার বিশ্বব্যাপী আন্দেলনেরও আমরা অংশীদার। তবে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহের জোট গঠনের ভণ্ডামিকে কখনও সমর্থন করিনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য হচ্ছে পরমাণু অস্ত্র যাদের হাতে নেই তাদের তা অর্জনের বিরোধিতা করা।

অসামরিক উদ্দেশ্যে দেশীয় প্রযুক্তিতে পারমাণবিক রিঅ্যাকটার (চুল্লি) তৈরিকে আমরা সমর্থন করেছি। এভাবে পরমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমাদের আপত্তি নেই। ইউ পি এ সরকারের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অসামরিক পরমাণু চুক্তির আমরা বিরোধিতা করেছি। কারণ এই চুক্তি আমাদের উপর এমন কতকগুলি শর্ত আরোপ করেছিল, যার ফলে আমাদের পরমাণু প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণার অধিকার থাকবে না এবং স্বাধীন বিদেশ নীতি অনুসরণ না করার বাধ্যবাকতা আরোপিত হবে। তাছাড়া, মার্কিন কোম্পানির কাছ থেকে আমাদের রিঅ্যাকটার কিনতে হবে। কিন্তু কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে মার্কিন কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা যাবে না (মোদি সরকার অবশ্য এসব বিপজ্জনক শর্ত মেনে নিয়েছে)।

পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তার বিষয়টি আজ বিশ্বজুড়ে গুরুত্ব পাচ্ছে। আমরাও বলছি এমনকি দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি বিদ্যুৎ কেন্দ্রকেও নিরাপত্তামূলক শর্তগুলিকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন করে তার প্রতিকার করতে হবে।

আমরা এটাও বলছি যে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া হতে হবে গণতান্ত্রিক এবং স্থানীয় জনগণকে না জানিয়ে তাদের মতামত না নিয়ে পরমাণু চুল্লি বসানোর আমরা বিরোধিতা করি। যেখানে যেখানে জনগণের বিরেধিতা রয়েছে, সেসব স্থানে পরমাণু চুল্লি বসানোর ক্ষেত্রে সরকারের অগ্রসর হওয়া সঠিক হবে না।

আমাদের দেশের বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনই একমাত্র উপায়— এ কথা ঠিক নয়। আমাদের সামনে বিকল্প রয়েছে। সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি এবং অন্যান্য বিকল্প শক্তির বিকাশে আমাদের জোর দিতে হবে। জীবাশ্ম থেকে উৎসারিত জ্বালানির বিকল্প অনুসন্ধানে আরও মনোযোগী হতে হবে।

প্রশ্ন: অটোমেশন সম্পর্কে মার্কসবাদী অবস্থান জানতে চাই। উৎপাদন বাড়াতে ও উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে অটোমেশন জরুরি। কিন্তু, এটা বেকারি বাড়ায়। তো , সমাধানের উপায় কি?

উত্তর: অটোমেশন হচ্ছে বৈদ্যুতিন শক্তিচালিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার, যার ফলে সময় ও শ্রম বেঁচে যায়। বিষয়টিকে প্রযুক্তির বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে।

প্রযুক্তির দুটো দিক রয়েছে— মানুষের কায়িক ও মানসিক 'শক্তি' বাড়ানো এবং মানুষের দক্ষতাকে মেশিনের কাছে হস্তান্তরিত করা। প্রযুক্তি মানুষের কর্মক্ষমতা অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। যেমন, জলশক্তি বা বাষ্পশক্তির ব্যবহার যন্ত্র চালানোর মূল চালিকাশক্তি। কম্পিউটার মানুষের বৌদ্ধিক ক্ষমতা বহুলাংশে বাড়াতে সাহায্য করে। বড় বড় সমস্যার দ্রুত সমাধান করে দিতে পারে কম্পিউটার। মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতা হস্তান্তরিত হচ্ছে মেশিনে। এর নামই অটোমেশন।

এই চালিকাশক্তি ও মানুষের দক্ষতা সম্মিলিত করে বস্ত্রকলে লাগানো হয়েছিল। এ ঘটনাই পাশচাত্যে শিল্প বিপ্লবের সূচনা করেছিল। সুতো কাটা ও পাকানোর কাজে এই যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রথম চালু করা হয়। প্রথমে জলের শক্তি ও পরে বাষ্পীয় শক্তি ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের কর্মক্ষমতা অনেকগুণ বেড়ে গেল। ল্যাঙ্কাশায়ারে গড়ে উঠল বহু সংখ্যক বস্ত্র কারখানা এবং তাতে শিল্প বিপ্লব ত্বরান্বিত হলো।

এর বিরুদ্ধে স্ব-উদ্যোগী তাঁতিরা ব্যাপক প্রতিবাদ সংগঠিত করে। তাদের বলা হতো 'লুডাইটস'। তারা আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহারে কাজ হারালো। ইংল্যান্ডের তাঁতিরা তো কাজ হারালোই, ভারতেরও প্রচণ্ড ক্ষতি হলো। আগ্রা, ঢাকা প্রভৃতি শহরে তাঁতিরা বিপন্ন হয়ে পড়ল এবং এই শিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো ব্রিটিশ ভারতে। মার্কস তাঁর 'পুঁজি' গ্রন্থে তখনকার গভর্ণর জেনারেলের রিপোর্ট থেকে উদ্বৃতি দিয়ে বলেছিলেন, "তাঁতিদের জীবনে যে দুর্দশা নেমে এসেছে তা বাণিজ্যের ইতিহাসে বিরল। তাঁতিদের হাড়গোড় যেন ভারতীয় সমতল ক্ষেত্রকে শুভ্র করে রেখেছে।"

এর কারণ কি? পুঁজিবাদে প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটে অন্য কায়দায়। তখন পর্যন্ত উৎপাদনের উপায়সমূহের (অনুন্নত যন্ত্রাদিসহ) মালিকানা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ছিল সেইসব কারিগরদের হাতে, যারা নিজেরাই উৎপাদন করত। কৃষকদের ক্ষেত্রেও জমির মালিকানা সামন্তপ্রভুদের হাতে থাকলেও উৎপাদনের উপায়সমূহ, যেমন লাঙল, চাষের জন্য গবাদিপশু এবং উৎপাদনের অন্যান্য সামগ্রী ছিল উৎপাদক - কৃষকদের হাতেই। তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, যে কোনও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, যা উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে, প্রযুক্তিগত সেই উন্নয়ন

কারিগর ও কৃষকদেরও সাহায্যে আসে।

পুঁজিবাদ এই বস্তুগত সত্যিটা পালটে দিল। শ্রমিকরা এখন যন্ত্রের মালিক নয়। এগুলোর মালিক হলো পুঁজিপতি শ্রেণী। সুতরাং উৎপাদনের চালিকাশক্তি হিসাবে যন্ত্রের প্রয়োগ এবং অটোমেশনের ফলে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ঘটলো বটে। কিন্তু শ্রমিকের প্রয়োজন কমে গেল, কিংবা শ্রমশক্তির দক্ষতা কমানোর প্রয়োজন হয়ে পড়লো। আসলে প্রযুক্তির ব্যবহার বা অটোমেশন শ্রমিকের শত্রু ছিল না। পুঁজিই সচেতনভাবে প্রযুক্তির এই অগ্রগতিকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। মার্কস লিখলেন, " শ্রমের হাতিয়ার এখন শ্রমিকদেরই বিদেয় করে দিল।"

মার্কস তাঁর পুঁজি গ্রন্থে কারিগর শ্রমিকদের প্রাথমিক প্রতিরোধপর্ব সম্পর্কে বলেছেন — শ্রমিকদের লড়তে হবে পুঁজিবাদেরই বিরুদ্ধে, মেশিনের বিরুদ্ধে নয়। এই চেতনা শ্রমিকদের মধ্যে গড়ে ওঠার আগেই লুডাইটসদের মেশিন ভাঙার আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। তিনি আরও দেখান যে, শিল্প বিপ্লব যাদের জীবন বরবাদ করে দিয়েছে, তাদের কাছে এটাই কিছুটা সান্ত্বনা যে, তারা বিপুলভাবে উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হলেন এবং অন্যান্য শিল্পে তাদের কিছু মাত্রায় কাজও জুটেছে। তিনি বললেন, নিজের পেশা থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা পরিণত হলেন গৃহপরিচারকে – যা কিনা ক্রীতদাসের সমতুল পর্যায়ের। এদের নিয়ে প্রথম গড়ে উঠলো ' পরিসেবা' ক্ষেত্র।

আজ এই সমস্যাগুলির সঙ্গে অটোমেশন যুক্ত হয়ে পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। আমাদের এখন অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদির ব্যবহার সংবলিত বহু কারখানা রয়েছে। এগুলিতে খুবই কম সংখ্যক শ্রমিকের নিযুক্তি ঘটে। কারিগরদের কাজের ক্ষেত্র ধ্বংস হওয়ার ফলে এবং কৃষিক্ষেত্র নিংড়ে নেওয়ার কারণে বেকারি ক্রমবর্ধমান। শিল্পক্ষেত্রে যে পরিমাণ কাজ সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল তা হয়নি। প্রচুর সংখ্যায় তরুণরা লেবার মার্কেটে ঢুকছে। জীবনধারণের জন্য কিছু একটা করার আশা নিয়েই তারা বাজারে ঢুকছে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

ভারতের পরিসেবা ক্ষেত্র মধ্যবিত্তদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, তাও সেটা আউটসোর্সিং-র মাধ্যমে, কলসেন্টার কিংবা সফটওয়্যার শিল্পে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কাজের সৃষ্টি হচ্ছে খুবই নগণ্য।

ক্যাজুয়েল শ্রমিকের সংখ্যা এখন দারুণভাবে বেড়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নির্মাণ শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু, কাজ অস্থায়ী এবং মজুরি কম।

উন্নত দেশগুলিতে কাজের ধরণ হচ্ছে ম্যাকডোনাল্ড টাইপের। ফলে, প্রচুর সংখ্যক

পরিসেবক সংস্থা, অটো, ট্যাক্সি, হকার, কিংবা স্বরোজগারি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে বাজার ছেয়ে গেছে। তাদের কাজের স্থায়িত্ব নেই, নেই কোনও সামাজিক নিরাপত্তা। এরা এক বিশাল ভাসমান শ্রমমজুতবাহিনীর অংশ, যাদের জীবন অনিশ্চয়তায় ভরা।

এমন কি, এখানেও অবস্থা খারাপ, অটোমেশন কিংবা বৌদ্ধিক ক্ষমতাসম্পন্ন মেশিনের ব্যবহার এখন কারখানা চত্বর থেকে রাস্তায় চলে এসেছে। চালকবিহীন গাড়ি, রোবট এবং কম্পিউটার এখন সব ধরনের কাজ ছিনিয়ে নিচ্ছে। মানসিক শ্রমের কাজ কিংবা ম্যাকডোনাল্ড ঘরানার কাজ—কোনওটাই এই ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ার বাইরে নয়। তাতে নতুন ক্ষেত্রগুলি এবং ম্যাকডোনাল্ড ঘরানার শিল্পগুলিতে বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত কর্মীরা আজ হুমকির সম্মুখীন।

শিল্প বিপ্লবের শুরুতে তাঁতি ও কারিগররা যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল, সেই একই ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে আজ মানসিক শ্রমদানকারীদের সামনেও।

আগের সঙ্গে আজকের পার্থক্য হচ্ছে, যন্ত্রাদি আজ জীবন্ত শ্রমের জায়গা দখল করছে। পুঁজিবাদে প্রযুক্তির যেভাবে উন্নতি ঘটে, তাতে করে মানবজাতির একটা বড় অংশকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আমরা এমন এক ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছি তা অতীতের শিল্প বিপ্লবের সময়কার পরিস্থিতির চাইতেও ভয়ঙ্কর। এই ভবিতব্যেব মূলকথা হচ্ছে, অস্থায়ী কাজ, শ্রমশক্তির তীব্রতর শোষণ এবং গণবেকারি।

' লুডাইট' আন্দোলনের ব্যর্থতা আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছে যে মেশিনের বিরুদ্ধে লড়াই না চালিয়ে একটা বিকল্প সমাধানের জন্য লড়তে হবে। আমাদের বোঝা দরকার যে, প্রযুক্তি ও অটোমেশন উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষমতা রাখে এবং আমাদের বিশ্রামের সময়ও বাড়ায়। একটি ছোট্ট অংশের বিপুল আয়ভোগীদের জীবন-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনে সামগ্রী উৎপাদনের পরিবর্তে সকল মানুষের প্রয়োজন মেটানোর শক্তি এর রয়েছে। তার অর্থ দাঁড়ায়, মানবজাতির বিরুদ্ধে পুঁজিবাদ যে যন্ত্রদানব কাজে লাগাচ্ছে, আমাদের সেই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেই লড়াই চালাতে হবে, যন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়। অবশ্য কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নকে ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ও কাজের বোঝা কমানো ইত্যাদি দাবিতে লড়াই চালাতে হবে। এটা করার সময়ে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের চেতনায় শ্রমিকশ্রেণীকে উদ্দীপিত করতে হবে।

একটা বিকল্প উন্নয়নের পথও বেছে নিতে হবে। এই পথ কখনও বৃহৎ পুঁজির নেতৃত্বাধীন চলতি কর্মহীন উন্নয়ন নয়। দেখতে হবে বিভিন্ন ধরনের অটোমেশন প্রযুক্তি যাতে আমাদের বড় ও ছোট শিল্পগুলিকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নামতে সক্ষম করে তুলতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে, এই প্রক্রিয়ায় যাতে শ্রমিকের কর্মহীনতা ব্যাপক না হয়।

বিদেশি পুঁজি ডেকে এনে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র মতো ফালতু স্লোগান নয়। আমরা আমাদের প্রযুক্তিকে উন্নত করতে ও জ্ঞান আহরণের পদ্ধতি শক্তিশালী করতে পারলে প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে পারব। তাতে কিছু নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হতে পারে। জ্ঞান- অন্বেষণের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিগণসহ দেশের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সামনে পুঁজির আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক সুতীব্র সংগ্রাম গড়ে তোলার কর্মসূচি উত্থাপন করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে, শুধু জ্ঞান - অনুসন্ধানী ব্যক্তিদের মুক্ত করাই নয়, পুঁজির হাত থেকে জ্ঞানকেও মুক্ত করতে হবে।

প্রশ্ন: সি পি আই (এম)- কে তথ্য জানার অধিকার আইনের অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতা করছে কেন পার্টি? কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন এক রায়ে বলেছে রাজনৈতিক দলগুলিকে এই আইনের আওতায় আনা উচিত তবুও রাজনৈতিক দলগুলি এই সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ কেন?

উত্তর: তথ্য জানার অধিকার আইনটি পাস করার সময় সি পি আই (এম) পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল। প্রথম উপা সরকারের সময় এই আইন পাস করা হয়েছিল। আমাদের পার্টি দৃঢ়ভাবে মনে করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির এবং সব রাজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তসমূহ ও আর্থিক ব্যয়ের বিস্তৃত তথ্য জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি কিন্তু 'সরকারি কর্তৃপক্ষ' নয়। অর্থাৎ এগুলি যেমন সরকারি নয় তেমনি সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানও নয়। কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের রাজনৈতিক দলগুলিকে এই আইনের আওতায় আনার চিন্তায় বেশকিছু অসুবিধা আছে। প্রথমত, রাজনৈতিক দলগুলি কিন্তু সরকারি বা সরকার স্বীকৃত বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মতো নয়। দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক দলগুলি সংবিধানের সন্তানও নয়। তাছাড়া, তৃতীয়ত রাজনৈতিক দল হচ্ছে নাগরিকদের একটি স্বেচ্ছমূলক সমিতি, যা কিনা মতাদর্শ রাজনৈতিক কর্মসূচি কিংবা একগুচ্ছ ভাবনা নিয়ে সহমতের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এটা কোনও সরকারেরই অর্থানুকুল্যে চলে না, কিংবা সরকারের সিদ্ধান্তমাফিক গঠিত হয় না। সেজন্য রাজনৈতিক দলকে ' সরকারি কর্তৃপক্ষ' বলে আখ্যায়িত করা যায় না।

রাজনৈতিক দলগুলির দলীয় তহবিলের স্বচ্ছতা বজায় রাখার রাজনৈতিক প্রশ্নটিকে সি পি আই (এম) সমর্থন জানিয়েছে। সি পি আই (এম) তার তহবিলের হিসাব নিকাশ স্ক্রুটিনির জন্য নির্বাচন কমিশনে পাঠায়। এই হিসাব জনগণ দেখতে পারেন। যে কেউ হিসাব মিলিয়েও দেখতে পারেন। আমাদের পার্টির তহবিল তৈরি হয় পার্টি সভ্যদের লেভি

থেকে। পার্টির গঠনতন্ত্রে নির্ধারিত হার অনুযায়ী প্রত্যেক পার্টি সভ্যকে লেভি দিতে হয়। ডোনেশন সংগৃহীত হয় পার্টি সভ্য ও সমর্থকদের কাছ থেকে। এছাড়া, পার্টির প্রতীক চিহ্ন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পার্টিকে বিশেষ লেভি দিতে হয়। তহবিলের এই উৎসগুলি জনসাধারণের জানা আছে, এবং যেহেতু রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্বাচন কমিশনের নিকট তহবিলের হিসাব পেশ করা বাধ্যতামূলক হয়েছে, তাতে হিসাব নিয়মিতই জমা দেওয়া হয় এবং নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়।

পার্টির অভ্যন্তরে সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়া সরকার ও সরকারি দপ্তরের সিদ্ধান্তগ্রহণের পদ্ধতির সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ফেললে চলবে না। রাজনৈতিক দলগুলির ভেতরে সুষ্ঠু ও অবাধ আলোচনা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এখন দলের অভ্যন্তরীণ এই পদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত যদি কেউ তথ্য জানার অধিকার আইনের মাধ্যমে আবেদন জানায় তাহলে তা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে।

রাজনৈতিক দলগুলির যাদের পরিকাঠামো ও সম্পদ কম তাদের পক্ষে এটা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে যে, ছোট বড় ইশুতে এতসব প্রশ্ন আসবে যেগুলোর উত্তর দিতে গিয়ে পার্টি- কাঠামোকে সারাক্ষণই ব্যস্ত থাকতে হবে। এই আইনে সরকারি দপ্তরে যেভাবে উত্তর দেওয়া হয়ে থাকে, রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে তা কোনওভাবেই সম্ভব নয়।

একটি জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন রাজনৈতিক দলগুলিকে এই আইনের আওতায় আনতে চাইছে। বিশেষ করে, দলগুলি কি পদ্ধতিতে নির্বাচনী প্রার্থী বাছাই করে এবং তাদের তহবিলে কোন্ কোন্ উৎস থেকে অর্থ আসে, তা আর টি আই-র আওতায় আনার জন্য কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন নির্দেশ জারি করেছে। এ নির্দেশ রাজনৈতিক দলগুলির নীতি নির্ধারণের অধিকার ও ক্ষমতাকে দারুণভাবে খর্ব করবে।

পরিশেষে, রাজনৈতিক দলগুলির তহবিল ও আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে চাওয়ার যে কোনও উদ্যোগকে সি পি আই (এম) সমর্থন করে। নির্বাচন কমিশন দলীয় তহবিলের হিসাবে পেশ ও জনসমক্ষে বিজ্ঞাপিত করার মাধ্যমেই তা করা যায়। কিন্তু, আমাদের পার্টি নিজস্ব গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলির কর্মধারা পরিচালনার অধিকার খর্ব করার যে কোন প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে। সুতরাং, কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন এই মর্মে যে বিজ্ঞপ্তি শীর্ষ আদালতকে জানিয়েছে, সি পি আই (এম) তার বিরোধিতা করেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ এবং এর অবমাননা করা কোনওভাবেই চলবে না।

প্রশ্ন : আর্জেন্টিনা ও ভেনেজুয়েলার নির্বাচনে বামেদের নির্বাচনী বিপর্যয় কি

লাতিন আমেরিকায় বামপন্থীদের অগ্রগতিকে বিপরীতমুখী করে দিচ্ছে? যদি তা-ই হয়, তবে তার কারণগুলি কি কি?

উত্তর : লাতিন আমেরিকার সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে বাম ও মধ্য বাম শক্তিগুলির পরাজয় নতুন করে দক্ষিণপন্থী আক্রমণেরই অংশ। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা এবং লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশে বাম দল ও সরকারগুলি নানা ধরনের শক্তির দ্বারা পরিচালিত। তারমধ্যে রয়েছে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী দল ও সরকার। ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া ও উরুগুয়েতে রয়েছে অধিকতর বাম ও প্রগতিশীল সরকার। গত নভেম্বরে আর্জেন্টিনায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পেরোনিস্ট প্রার্থীকে পরাস্ত করে একজন দক্ষিণপন্থী প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। এটা গত ১৩ বছর ধরে রাষ্ট্রপতি ক্লিচনার এবং তার পরে তার পত্নী ক্রিশ্চিনা ফার্নান্দেজের অনুসৃত জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের নীতি পালটে দেওয়ার অধ্যায়ের সূচনা করছে।

ব্রাজিলে গত দেড় দশক যাবৎ দেশ পরিচালনা করছিলেন প্রেসিডেন্ট লুলা ও তারপরে দিলমা রুসেফ। এই সরকারগুলোর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠে এবং দক্ষিণপন্থী দলগুলি সমর্থন বাড়াতে সক্ষম হয়। নয়া উদারবাদী নীতির বিকল্প নীতিমালা রূপায়ণের ব্যর্থতা এ ধরনের বিপর্যয় ডেকে এনেছে। অবশ্য দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বেশ কিছু ভালো পদক্ষেপ এই সরকারগুলো গ্রহণ করেছিল— তা অস্বীকার করা যাবে না।

ভেনেজুয়েলায় চাভেজের নেতৃত্বে বলিভারীয়ান বিপ্লবী আন্দোলনের পথ ধরে একটি বামপন্থী সরকার দু'দশক ধরে কাজ করেছে। কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে দক্ষিণপন্থী জোট প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হয়েছে। অবশ্য এখনও বেশ কিছু কার্যকরী ক্ষমতা প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর হাতে রয়েছে। মাদুরো হচ্ছেন চাভেজ প্রতিষ্ঠিত সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতা।

ভেনেজুয়েলায় সংগ্রামটা কী ছিল? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মদতপুষ্ট দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলির সঙ্গে বাম প্রগতিশীল শক্তিগুলির সংগ্রাম। এই সংঘাত তীব্রতর হয়েছে। এখনই এ কথা বলার সময় আসেনি যে ভেনেজুয়েলায় বামপন্থী স্রোত উলটোদিকে বইতে শুরু করেছে। ভেনেজুয়েলার অর্থনীতি বিপর্যস্ত। বিশেষ করে বিশ্ববাজারে তেলের দাম পড়ে যাওয়ায় এই সমস্যা আরও গভীর হয়েছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কম যোগান এবং অপরাধ বৃদ্ধির ফলে জনগণের জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এটা মনে রাখতে হবে ভেনেজুয়েলা একটি উঁচুমাত্রার অসম পুঁজিবাদী সমাজ, যেখানে বামপন্থী সরকার এসব সমস্যা মৌলিক পরিবর্তনের জন্য কাজ করছিল। সাক্ষরতা, শিক্ষা,

স্বাস্থ্য পরিসেবা ও খাদ্যে ভরতুকি চালু করে এই লক্ষ্যে বেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছে।

যদি ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি ও চাভেজপন্থীরা দেশের অর্থনীতিকে উদ্দীপিত করতে প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণে তৎপর থাকে, যাতে শ্রমজীবী জনগণের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা ও অধিকার নিশ্চিত হয় এবং দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলিকে মোকাবিলা করতে জনগণের ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলা যায় তাহলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। সামরিক বাহিনী ও বিচার ব্যবস্থার উঁচুতলায় বলিভারীয়ান বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি শক্তিশালী সমর্থন রয়েছে।

রাষ্ট্রপতি মাদুরোর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হবে ২০১৯ সালে। বহু ধরনের বাধা-বিপত্তি- প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও চাভেজপন্থী ও বাম শক্তি জনগণকে সমবেত করে বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় যদি এগোতে পারে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বড় ধরনের দুর্বলতাগুলি দূর করতে যদি সক্ষম হয় এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিদ্যমান ব্যবস্থাগত দুর্নীতিকে মোকাবিলা করতে পারে, তাহলে তারা চলতি দক্ষিণপন্থী আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে।

নির্বাচনী সাফল্য ও বাম ধারার সরকারগুলির প্রতিষ্ঠা নয়া উদারবাদী নীতি ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সংগ্রামের অগ্রগতি সূচিত করেছে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে এসব দেশ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে এবং বুর্জোয়া শ্রেণীগুলি ও তাদের আন্তর্জাতিক মদতদাতারা নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকবে। তাদের অনেক কিছুই করার ক্ষমতা রয়েছে এবং করবেও। ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি বামেদের নির্বাচনী পরাজয় ঘটতেই পারে। কিন্তু শ্রেণী সংগ্রাম ও সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যদি বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতি ঘটানো যায়, তবে এ ধরনের নির্বাচনী বিপর্যয় হবে সাময়িক।